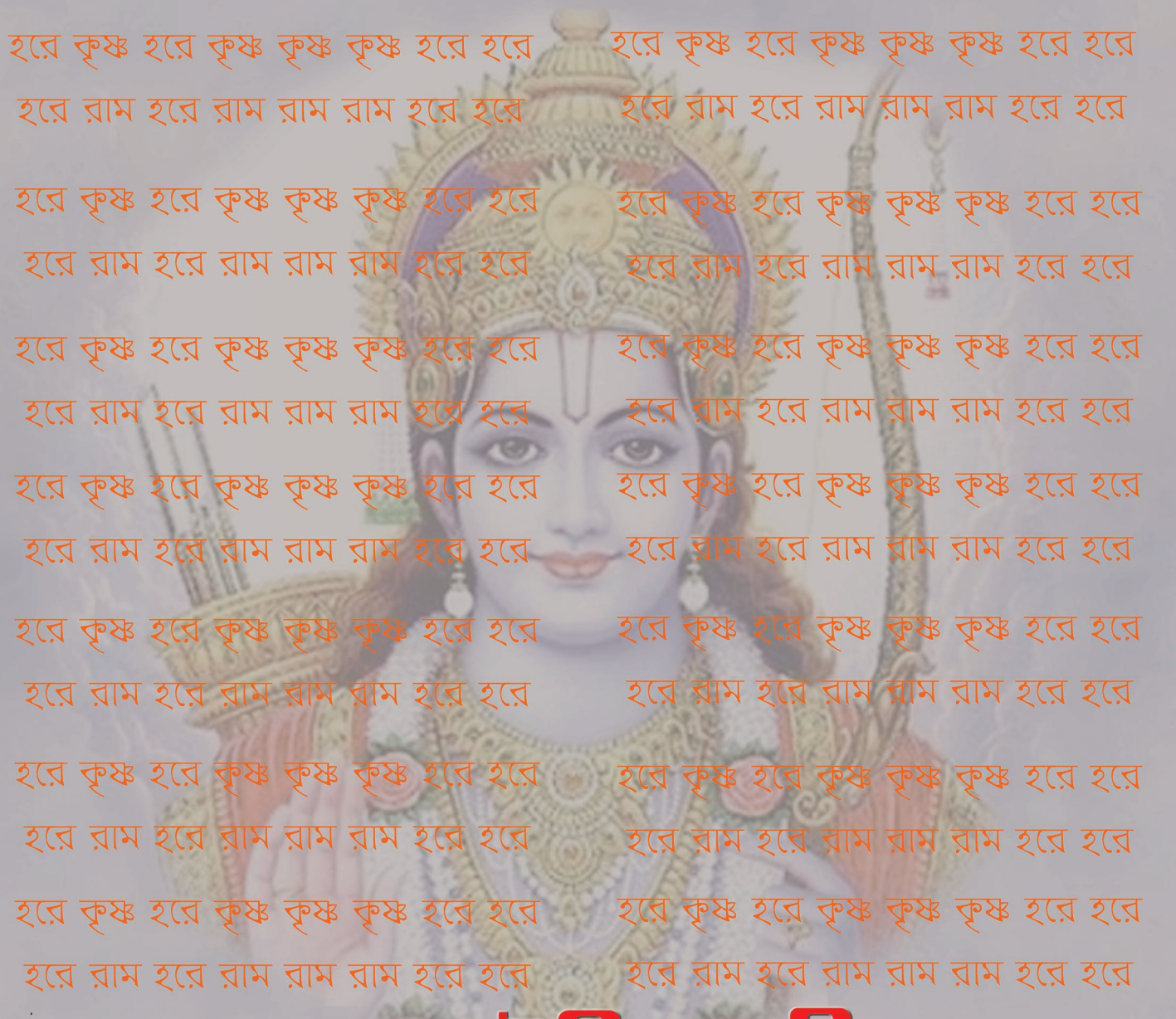
দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে পশ্চিমবঙ্গে কোনোভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শহিদ হতে দেওয়া যাবে না— পৃঃ ১৫

ভারতবর্ষে রামের মতো সত্য আর কেহ নহে — পৃঃ ১৯

৭১ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ২২ জুলাই ২০১৯।। ৫ শ্রাবণ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



বাঙ্গলার লৌকিক জীবনে রাম ও রামায়ণ অবিচ্ছিন্ন

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ৫ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২২ জুলাই - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

ভারতবিরোধী ও পাকপ্রেমীদের চেনাল বিশ্বকাপ ক্রিকেট ▯ বিশ্বমিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদি 'প্রশান্ত' শাসনে থাকুন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

ভাষানীতি নিয়ে অযথা শোরগোল, শিক্ষানীতির খসড়া প্রশংসার দাবি রাখে ▯ চেতন ভগত ▯ ৮

রাহুল গান্ধীর মতো ব্রিটিশ শাসকরাও ভারতীয়দের কুকুরের সমগোত্রীয় ভাবতেন ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১১

রজত জয়ন্তীবর্ষে সারদা বিদ্যামন্দির ▯ ড. বৃন্দাবন ঘোষ ▯ ১৩

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে রাজ্যে কোনোভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শহিদ হতে দেওয়া যাবে না ▯ সুজিত রায় ▯ ১৫

ভারতবর্ষে রামের মতো সত্য আর কেহ নহে ▯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ▯ ১৯

রামভক্ত রবীন্দ্রনাথ ▯ পরমেশ চৌধুরী ▯ ২২

কৃত্তিবাসী রামায়ণ : সনাতন বাঙ্গালি সংস্কৃতির প্রতীক ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৩

বঙ্গদেশের লৌকিক জীবনে রাম ও রামায়ণ ▯ ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৪

শ্রীরামচন্দ্র ও বঙ্গ-সংস্কৃতি ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ২৬

পাথুরিয়াঘাটা মল্লিকবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি উৎসব ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩১

ভারতীয় নৃত্য-ঐতিহ্যের এক অনন্য মহাকাব্য বলরামভারতম্ ▯ কৌশিক রায় ▯ ৩২

স্বর্ণগৈরিক অরুণকেতনই ভারতের রাষ্ট্রধ্বজ ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

ধ্বংসপ্রাপ্ত ঢাকার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রমনা কালীবাড়ি ▯ বরুণ দাস ▯ ৩৫

চার মাসের বাজেটে সময়ের বিস্তীর্ণ রূপরেখা ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩৭

ইতালিতে সনাতন ধর্মের ব্যাপকতায় হিন্দুদের ভূমিকা ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৭-১৮ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ খেলা : ৪১▯ অঙ্গনা : ৪২ ▯ সুস্বাস্থ্য : ৪৪ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৫ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ▯ স্মরণে : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৯ জুলাই
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৯ জুলাই
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী

নেতা আমরা কাকে বলব? যিনি শুধু ভোটে জেতেন, নাকি যিনি মানুষকে ইতিবাচক ভাবনাচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। বস্তুত, ভোটে জেতা নেতা তো আমরা ১৯৫২ সাল থেকে দেখছি। কিন্তু নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর মতো মানুষকে ইতিবাচক ভাবতে শেখানো নেতা এর আগে বিশেষ দেখা যায়নি। অন্তত গত পঞ্চাশ বছরে অটলবিহারী বাজপেয়ী ছাড়া রাজনীতিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো নেতাকে পাওয়া যায়নি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদী। তাঁর নেতৃত্ব, দেশভাবনা, সমাজভাবনা নিয়ে থাকবে একাধিক বিশ্লেষণাত্মক রচনা। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুজিত রায় প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার



SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বাঙ্গলার বন্ধন চিরকালীন

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ইদানীং অর্থশাস্ত্র লইয়া যত না বাক্য বিনিময় করেন, তাহার অধিক বাক্য বিনিময় করেন বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার্থে। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে সুদূর মার্কিন মুলুক হইতে উড়িয়া আসিয়া তিনি এই দেশের নাগরিকদের পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহারা যেন বিজেপিকে ভোট না দেন। দেশের সচেতন নাগরিকেরা অবশ্য সেন মহাশয়ের এই অযাচিত উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। তাহারা নিজেদের বিবেক বুদ্ধি দিয়া সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করিয়াই বিজেপিকেই ভোট দিয়াছে। দেশবাসীর নিকট এমন একটি 'গণতান্ত্রিক চপেটাঘাত' (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি) খাইয়াও সেন মহাশয় দমেন নাই। বিজেপিকে ঠেকাইতে পারিলেন না তো কী হইল। শ্রীরামচন্দ্র তো আছেন। অতএব শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়াই পড়িয়াছেন উনি। এ অনেকটা সেই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন নেকড়ের মতো, যে বলিয়াছিল— 'তুই খাস নাই তো কী হইয়াছে, তোর বাপ তো জল খাইয়াছে।' সেন মহাশয় সম্প্রতি বলিয়াছেন— 'রামচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার কোনো আত্মিক যোগ নাই। জয় শ্রীরাম ধ্বনি আসলে রাজ্যবাসীর মতে ভীতি প্রদর্শনের জন্য উচ্চারিত হইতেছে।' অমর্ত্যবাবু ইত্যকার কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের তাবৎ ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা সোৎসাহে ময়দানে নামিয়া পড়িয়াছে। তাহারা বলিতে শুরু করিতেছে, রাম আরাধনা বঙ্গে বেমানান। বাঙ্গালির সংস্কৃতির সঙ্গে, তাহাদের মতে, রামচর্চা নিতান্তই বেমানান।

অমর্ত্য সেন বহুদিন আমেরিকা প্রবাসী। শীতের শান্তিনিকেতনে অবসর অতিবাহিত করা ছাড়া তাহার সহিত দেশের আর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তাহা চট করিয়া মনে করা মুশকিল। রথসচাইল্ড পরিবারের এই জামাতা দীর্ঘদিন প্রবাসের ফলে হয়তো বঙ্গ সংস্কৃতিকে বিস্মৃত হইয়াছেন। আর এই রাজ্যের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মহল? তাহারা বরাবরই দেশের ঠাকুর ফেলিয়া বিদেশের কুকুরের পিছনে ঘুরিয়াছেন। এখনও ঘুরিতেছেন। ফলে বঙ্গ সংস্কৃতির হৃৎস্পন্দনটি বুঝিতে পারা কঠিন। যাহারা আজ বলিতেছেন, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বাঙ্গালার আত্মিক যোগ নাই, তাহারা হয়তো বিস্মৃত হইয়াছেন, পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাস ওঝা বাল্মীকি রামায়ণের অনুকরণে বাঙ্গলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। বহু শত বৎসর ধরিয়া সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে, চণ্ডীমণ্ডপে পঠিত হইয়া আসিতেছে। এতদিনেও তাহাতে কোথাও ছেদ পড়ে নাই। এই যে রামায়ণ পাঠের পরম্পরা তাহাই যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বরূপ, এস ওয়াজেদ আলি তাহার ছোট গল্প 'ভারতবর্ষ'-এ তাহারই একটুকরা চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বাঙ্গলার মৃত্তিকার কোনো সম্পর্ক নাই বলিয়া যাহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন, তাহাদের জ্ঞাতার্থে আরও বলা যায়, এই বাঙ্গালায় রামায়ণের উপর ভিত্তি করিয়া বহু পুঁথি রচিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণদাস বিরচিত রামনাম উপাসনা, পঞ্চানন চক্রবর্তীর রামরসায়ন, নটবর দত্তের রামজন্ম পালা, অদ্ভুতাচার্যের পুঁথি, উৎসবানন্দের 'লবকুশ যুদ্ধ', কবিচন্দ্র দ্বিজ প্রমুখ বহুখ্যাত এবং অখ্যাত কবির রচনা। পূর্ববঙ্গের চন্দ্রাবতীর রামায়ণ মধ্যযুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। বঙ্গদেশে শ্রীরামচন্দ্র যে বহু শত বৎসর পূর্ব হইতেই পূজিত, তাহারও প্রমাণ এই বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু প্রাচীন রামমন্দিরগুলি। অমর্ত্যবাবু এবং তাহার সমর্থকগণ ইহাও মনে রাখিলে ভালো করিবেন যে, এই বাঙ্গালার সর্বাধিক জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব আশ্বিনকালের দুর্গাপূজা। আশ্বিনের এই দুর্গাপূজার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন— 'রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইযা শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড় সমালোচকই হই না কেন, একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।'

সুভাষিতম্

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেৎ বিত্তমেতি চ যাতি চ।

অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ।।

চরিত্রকে যত্নপূর্বক রক্ষা করা প্রয়োজন। ধনসম্পদ আসা-যাওয়া করতেই তাকে। ধন নষ্ট হলে ব্যক্তি নয় হয়ে যায় না, কিন্তু চরিত্র নষ্ট হলে বক্তি মৃতের সমান হয়।

ভারত-বিদ্বেষী ও পাক-প্রেমীদের চেনাল বিশ্বকাপ ক্রিকেট

বিশ্বামিত্র-র কলম

ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে ভারত তখন সবেমাত্র জিতেছে। ফেসবুকে পোস্ট হতে শুরু করল ভারত খেলায় জিতল, কিন্তু হৃদয় জিতল বাংলাদেশ। ম্যাচের আগের পরিস্থিতি ছিল সাংঘাতিক। বাংলা পক্ষের পালের গোদার নামে কথাটা রটলেও, রটনাটা ঘটনাই ছিল। এই বাঙ্গালি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সুকৌশলে প্রচার করছিল ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা সবাই 'গুটকাখোর', বাংলাদেশে এগারো জন বাঙ্গালি খেলোয়াড়। সুতরাং সব বাঙ্গালিরই বাংলাদেশকে সমর্থন করা উচিত। ইংল্যান্ড ভারতকে হারিয়ে দেওয়ায় সেমিফাইনালে পাকিস্তানে যাওয়ার রাস্তা কঠিন হয়ে যাওয়ায়, পাক মিডিয়া ও তাদের কিছু ক্রিকেটারের সুরে সুরে মিলিয়ে ফেসবুকে কটাক্ষ উপচে পড়ল ভারত তার প্রাক্তন প্রভুদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করল বলে। এমন যে কতশত নমুনা আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতের কাছে বিপুলভাবে হারার পর ভারতে রানরেট চাঙ্গা হয়, সেমিফাইন্যালে যাবার পথ প্রশস্ত হয়, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন ওঠে সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ যারা এককালে ক্রিকেট দুনিয়া কাঁপাত, প্রথম দুটি বিশ্বকাপও জেতে, তারা কেন ভারতের সামনে এভাবে আত্মসমর্পণ করবে?

সবচেয়ে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হলো, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ভারতের লড়ে হারার পর। একজন উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখল : 'দেশ যার যার, ভারতের হারে আনন্দ সবার।' এক কবি, জীবনে কোনওদিন ক্রিকেট ব্যাট চোখে দেখেছে কিনা সন্দেহ, তার আনন্দ ফুটে উঠতে দেখা গেল। ব্যাটিং-এ ভারত ৫ রানে ৩ উইকেট হারাতেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে লিখত বোলিং সুইং-এর সামনে পড়তেই ভারতের ব্যাটিং জারিঝুরি শেষ। ধোনি-রবীন্দর জাদেজা সেদিন নেহাত ভাগ্যের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন, নচেৎ এই ধরনের বাচাল মূর্খদের অশিক্ষিতামোর জবাব পেতে বেশি সময় লাগতো না। ভাবছেন এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ফেসবুকে কিছু অপোগণ্ডের নিজস্ব মতামত?

বিষয়টি যে এত সহজ নয়, তা জানান দিয়েছে ভারত-বিদ্বেষী ও পাক-প্রেমীদের মুখপত্র সেই দৈনিকটি। 'খোদা' কবি-কন্যা 'ডি-ফ্যাক্টো এডিটর' ও নকশালি নিধিরাম সর্দার সম্পাদক এবং এদের সম্পাদকীয় চ্যালাচামুণ্ডাদের জন্য এই পত্রিকার চরিত্র সবারই জানা। রবিবারে তাদের সম্পাদকীয়র তলায় কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় প্রকাশিত হয় রসিকতা (এই বস্তুটি আগে ছিল, এখন নিখাদ ভাঁড়ামি)-র ঢঙে অল্প কথায় কিছু লেখা প্রকাশ হয়। ভারত হারার পর সেই ভাঁড়ামির অনুচ্ছেদও দেখা গেল তার চরিত্র পাল্টে ফেলেছে। ভাঁড়ামির রূপ দেওয়ার একটা দুর্বোধ্য চেষ্টা হলেও দেখা গেল বিষয়টা নিয়ে তাদের 'সিরিয়াসনেস', কিছুটা আক্ষেপের সুরেই তাদের বক্তব্য আগে ভারত হারলে খেলোয়াড়দের কুশপুতুল পোড়ানো, বাড়ি-ঘর ভাঙচুর এসব হতো, এবার সব চুপ কেন? এরপরেই এসেছে সেই কটাক্ষ— সেমিফাইনালে হারুকগে পাকিস্তানের কাছে না হারার সান্ত্বনা? এই সংবাদপত্রের পাকিস্তান প্রেম হাল সময়ে, এটা ঠিক নয়। এই পত্রিকার এক রিপোর্টের (পরে অবশ্য তিনি ঘাড়ধাক্কা খান) তাঁর সহকর্মীর হয়ে এইরকমই একটি ব্যঙ্গ প্রতিবেদন লিখেছিলেন। তাঁর সেই সহকর্মীটি ক্রিকেটে পাকিস্তানের হয়ে দালালি করতে গিয়ে উল্টোডাঙ্গার মোড়ে জনগণের হাতে হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। এদেরই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক 'নিরপেক্ষ' হয়ে ক্রিকেট উপভোগ করুন, ভারতকে সাপোর্ট করবেন না গোছের তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। এক খুব নামি সাংবাদিক যতদিন এদের 'স্পোর্টস এডিটর' ছিলেন ততদিন এদের ক্রীড়া প্রতিবেদন লোকে পড়তো। এখন যারা লিখছে তার একটু-আধটু খেলা বুঝলেও পাক-তাঁবেদার সম্পাদকীয় বিভাগের চাপে খেলার সঙ্গে রাজনীতি গুলিয়ে দিচ্ছে। ফলে সেই অখাদ্য-অপাঠ্য লেখাগুলোর ক্রীড়াপ্রেমী পাঠকও নেই।

এবার ফেসবুকে বিশ্বকাপের একটি 'কমন ট্রেন্ড' পাওয়া গিয়েছে, হঠাৎ করে কিছু লোক 'ক্রিকেট-বোদ্ধা' হয়ে গেল, যে লোকগুলির ফেসবুক ওয়ালে রাজনৈতিক উস্কানি আর মোদী বিরোধিতার মুখোশের আড়ালে দেশবিরোধিতা ছাড়া আর কিছু নেই। ভারত পাকিস্তান বা বাংলাদেশকে না হারিয়ে ওই দেশগুলি ভারতকে আড়ালে ক্রিকেট বোদ্ধার বর্ম এরা রক্ষা করতো না, ক্রিকেট ভক্তির আড়ালে যে দেশের প্রতি এদের তীব্র ঘৃণা জমে আছে তা উগরে দিয়েছে ভারতের দুর্ভাগ্যজনক ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর। এই লোকগুলোই পুলওয়ামায় নিহত ভারতীয় জওয়ানদের শহিদের মর্যাদা দিতে আপত্তি করেছিল, প্রত্যাঘাতে ভারতীয় বাহিনী বালাকোটে জঙ্গি ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করার পর জঙ্গিদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল। এই লোকগুলিই 'মোদী-বিরোধিতা মানে দেশ-বিরোধিতা নয়' গোছের তত্ত্ব সামনে এনে লোকসভা জোট বিরোধীদের জেতাতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল। ২০১৯-এর বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রমাণ করল এই লোকগুলি চরিত্রে আসলে পাকপন্থী ভারত-বিদ্বেষী। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে পাকিস্তান ভারতকে তাদের ঘোষিত শত্রুরাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাই 'ক্রিকেটে ভারত-পাক ম্যাচে আমি নিরপেক্ষ' এই পরিস্থিতি জঙ্গি মদতপুষ্ট পাকিস্তান রাখেনি। সুতরাং ভারতেরও তা রাখবার দায় নেই। এক হাতে তালি বাজে না।

২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনের সময় এদের পাক-প্রেম মোদী বিরোধিতার তত্ত্বে যাও বা কিছুটা আড়াল ছিল, নির্বাচনের কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বকাপ ক্রিকেট তাকে বেআব্রু করল। ক্রিকেটের সঙ্গে যারা রাজনৈতিক সংযোগ ঘটাতে মরিয়া, তারাই সুচতুর ভাবে ক্রিকেটের সঙ্গে 'দেশপ্রেম'-কে বিযুক্ত করতে সচেষ্ট। এদের চিনে রাখা জরুরি। কারণ এদেশে বসবাসকারী ঘর শত্রুরা আমাকে আপনাকে এদেশের যে কোনও সাধারণ নাগরিককে যে কোনও মুহূর্তে বিপদে ফেলতে পারে।

দিদি 'প্রশান্ত' শাসনে থাকুন

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূলনেত্রী, কালীঘাট

আপনি দিদি যখন যেটা মনে আসে দুম করে বলে দেন। আগু পিছু সাত-সতেরো, শব্দ-ব্যাকরণ সব সময়ে যে ভেবে বলেন এমন নয়! আমরা জানি আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরকমই! এটাই অ্যাদ্দিন আপনার রাজনীতির পুঁজিও ছিল। কিন্তু এখন আবহাওয়া খারাপ। পরিস্থিতিও মোটেও সুখকর নয়। বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের রাজনৈতিক কৌশল স্থির করতে তাই তো দিদি আপনাকে প্রশান্ত কিশোরের পেশাদার সংস্থার সাহায্য নিতে হচ্ছে। আর সেই প্রশান্ত কিশোরই আপনাকে শাসন করছে। মেনে নিন দিদি মেনে নিন। যদি সুখ মেলে তাতে। আসলে আপনার অবস্থা এখন যা তাতে খড়কুটোকেও মানুষ আঁকড়ে ধরে। তাই ধরুন।

সম্প্রতি আপনার সঙ্গে দেখা করে প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, আপনি কোনও বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেবেন না। অন্তত তিন মাস চুপ থাকুন। সরকারি অনুষ্ঠানে, জনসভায়, দলের কর্মীসভায় বক্তৃতা দিন। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে, দুম-দাম জবাব দেওয়ায় আপাতত বিরতি দিন। সেই সঙ্গে দলের কর্মীসভায় আপনার বক্তব্য সরাসরি সম্প্রচারও বন্ধ রাখুন। মেনে নিন দিদি। দোহাই আপনায়। মুখ বন্ধ রাখুন। খুললেও শুধু ভালো ভালো কথা বলবেন। তাছাড়া যে গতি নেই। আপনি আজকাল মুখ খুললেই ভুলভাল বকে ফেলছেন। জয় শ্রীরাম শুনলেই আপনার মাথা গরম হয় জানি। কিন্তু এখন তো গোটা রাজ্যে ওই ধ্বনিতেই মজেছে তাই আপনাকে প্রশান্ত থাকতে হবে। হবেই।

লোকসভা ভোটের ফলাফল দেখার পরে আপনি স্বাভাবিক ভাবেই বিরক্ত ছিলেন। সেই কারণে কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠকে সেই যে সংখ্যালঘু ভোটের প্রশ্নে বলে ফেললেন, 'যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথিও খাব'। একথা বলার পিছনে রাজনৈতিক ভাবনায় ভুল ছিল না আমি জানি। আপনি যে লাথি মারা গোরুদের ভক্ত সেটা সবাই জানে। কিন্তু তাবলে ওভাবে কেউ বলে! উপস্থাপনা বলে তো একটা জিনিস আছে নাকি! তারপর সেই ভোটের আগে পুলওয়ামার ঘটনা আপনি বলেছিলেন, ''কোনও রকম তদন্ত ছাড়াই কাউকে দোষারোপ করা ঠিক হচ্ছে না।'' তখনও সেই কথাটি মানুষ ভালো ভাবে নেয়নি। কেন নেবে বলুন তো! ভারত থেকে পাকিস্তানের জন্য অত ভাব কি ঠিক নাকি!

তবে আপনার রাজনৈতিক ভাবনা বা কৌশলে ভুল ছিল না। কারণ, আপনি ওই বক্তব্য দিয়ে আপনার প্রিয় ভোটব্যাঙ্ককে খুশি করতে চেয়েছিলেন। কে বলতে পারে ওটা না বললে আরও আসন কমে যেত না! যে যা বলে বলুক আমি কিন্তু জানি দিনি আপনার সব কিছুই ভেবে চিন্তে করা। তবে এখন পরিস্থিতি যা তাতে ওইটুকু ভাবনায় কাজ হবে না। আরও ভাবতে হবে। সেটাই প্রশান্ত দাদা ভাবছেন। ওনার ভাবনা মতো মুখ একটু বন্ধই রাখুন। আসলে প্রশান্ত দাদা টের পেয়েছেন যে, আপনি যাঁদের লাথি মারা গরু মনে করেন তাঁরাও সবাই আপনার পক্ষে আর নেই। সর্বত্র পরিবর্তনের আঁচ।

শুনছি যা তাতে, শুধু এই পরামর্শটুকুই দেননি প্রশান্ত দাদা। তাঁর এও পরামর্শ যে বিধানসভা ভোট পর্যন্ত ইতিবাচক রাজনীতি করুক তৃণমূল। সরকার ও দল উন্নয়নের কথা বলুক। কারণ, প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক এলাকাতেও গত আট বছরে যে উন্নয়নের কাজ হয়েছে তা স্রেফ নেতিবাচক রাজনীতির জন্য হারিয়ে যাচ্ছে। খাদ্যসাথী, কন্যাশ্রী, সবুজসাথী ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার যে উপভোক্তা শ্রেণী তৈরি করেছে, তাদের অনেকের ভোটও শুধু নেতিবাচক রাজনীতির জন্যই তৃণমূল পায়নি। তার মধ্যে আবার মিশে গেছে কাটমানি প্রকল্প। সব মিলিয়ে যা তা অবস্থা। কেন্দ্রের প্রকল্প যে আপনি কায়দা করে রাজ্যের নাম করে ফায়দা তুলতে চেয়েছিলেন সে গুড়েও এখন বালি। সবাই নাকি সব বুঝে গেছে।

বিধানসভা ভোটে একা ২১১টি আসন জিতলেও বাঙ্গলাকে বিরোধী শূন্য করতে কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে একের পর বিধায়ক, কাউন্সিলর ভাঙিয়ে আনারও মাশুল দিতে হচ্ছে এখন। পঞ্চায়েত ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বারো আনা আসন জেতার চেষ্টাও মানুষ ভালো ভাবে নেয়নি। আপনার সরকার বাজেট ঠিক ভাবে পাশ করে না। সরকারের কোনও হিসেব নিকেশের অডিট হয় না। এসব কিছুই এখন মানুষ বুঝতে পেরে গেছে। এসব দেখেই আতঙ্কিত প্রশান্ত দাদা। তিনিও কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবু চুপ থাকুন।

ভুলভাল বকাটা একটু বন্ধ থাকুক।

—**সুন্দর মৌলিক**

ভাষা নীতি নিয়ে অযথা শোরগোল, শিক্ষা নীতির খসড়া প্রশংসার দাবি রাখে

অতিথি কলম



চেতন ভগত

আক্ষরিক অর্থেই ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রণালীর ভুল ত্রুটি নিয়ে কয়েকশো নিবন্ধ লেখা হয়ে গেছে। একই সঙ্গে এ নিয়ে বই-পত্তর, চলচ্চিত্র, টিভি শো কিছুই বাদ যায়নি। সবেরই উপজীব্য ভারত ও তার শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি। অবশ্যই আমরা শিক্ষানীতির গলদগুলি চিহ্নিত করে তার দূরীকরণ সম্পর্কে কেউই দ্বিমত নই। কিন্তু যেই মাত্র কেউ বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতো প্রয়োজনীয় সংশোধনের কোনো প্রচেষ্টা নেয় তখনই আমরা তার ভুল ধরতে আদাজল খেয়ে লেগে পড়ি। প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে এক ধরনের উন্নাসিকতা প্রকাশ ও সন্দেহ প্রবণতা আমরা চেপে রাখতে পারি না।

ঠিক এরকমটাই ঘটেছে কয়েক সপ্তাহ আগে। সরকারের নিযুক্ত একটি কমিটি তাদের বিচার বিবেচনার পর একটি জাতীয় শিক্ষা নীতির দিকনির্দেশ দিয়ে ৪৮৪ পাতার খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করেছে। প্রস্তাবে চলতি ব্যবস্থার গলদগুলি স্বীকার করে নিয়ে সমাধান সূত্র বের করার নির্দেশ আছে। প্রস্তাবে নানা ভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন grade-এর প্রস্তাবনা আছে। একই সঙ্গে সমস্যাবহুল শিক্ষা ব্যবস্থাকে খানিকটা সঠিক পথে আনার একটি রোডম্যাপ তাঁরা দিয়েছেন। এটি কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ নিখুঁত প্রস্তাবনা নয়। আর ঠিক সেই কারণেই এটি উৎসাহী ব্যক্তিদের কাছ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ নিয়ে যাতে ছাত্রোপযোগী করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই খসড়া হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন ও কার্যকরী প্রস্তাব নাগরিকদের কাছ থেকে আহ্বান করা হয়েছে। এমন একটা উল্লেখযোগ্য প্রয়াস নিয়ে নিজস্ব চিন্তাভাবনা শুরু না করে খসড়া প্রস্তাব থেকে প্রধানত তিন ভাষা নীতি সংক্রান্ত মনোমতো কয়েকটা লাইন তুলে নিলাম। এর পরই যুগযুগান্ত ধরে বহু চর্চিত পচনধারা উত্তর-দক্ষিণ বিভাজনের তাসটি খেললাম। দক্ষিণের রাজ্যগুলির ওপর জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে একটি ত্রাহি রব তুলে লোক খেপাতে শুরু করলাম। একটা হৈ হট্টগোলের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল। সকলেই জানেন ভারতে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে বাস্তবে একটা বিভাজন আছেই। আর এই বিভাজনটি নিয়ে সার্বিক রাজনৈতিক খেলা খেলতে পারলে লাভের সম্ভবনাও প্রবল (দক্ষিণের বহু রাজনৈতিক উত্থান পতনের উৎস ভাষা ভিত্তিক নানা আন্দোলন)। এই কৌশলে মত্ত থেকে NEP (National Education Policy)-এর মূল প্রতিবেদন ও প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি আমরা বেমালুম ভুলে গেলাম। যে সমস্ত ব্যক্তি অত্যন্ত অধ্যাবসায় ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার গেড়ে বসে থাকা দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধানের প্রচেষ্টা করছিলেন তাঁদের কোনো উৎসাহ না দিয়ে গোটা বিষয়টিকে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুত্ব বা বিজেপি'র অ্যাজেন্ডা অনুসরণ করা দানব ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললাম। সম্পূর্ণ ন্যক্কারজনক কাজ।

> "ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি একজন উদার ভারতীয়ের পক্ষে দক্ষিণের তামিলভাষা শেখা নিশ্চিতভাবে শুধু নম্বর বাড়াবার জন্য সংস্কৃত শেখার থেকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। শিক্ষা ব্যবস্থা বা ভাষা শিক্ষা উদ্দেশ্য নিয়ে অনাবশ্যক রাজনীতি করার কোনো প্রয়োজন নেই।"

NEP সংক্রান্ত কয়েকটি ভালো দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। প্রথম মনে রাখা দরকার এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন স্বনামধন্য ISRO-এর ভূতপূর্ব প্রধান কে. কস্তুরীরঙ্গম। আচ্ছা, আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততিরা কী পদ্ধতিতে পড়াশোনা করবে সেটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেউ আছে কি? শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে আছেন আরও দশজন শিক্ষাজগতের বিদগ্ধ পণ্ডিত। এই রিপোর্টের মুখবন্ধে একটি অসাধারণ দূরদৃষ্টি সংবলিত প্রস্তাবনা রয়েছে। ভারতের নতুন শিক্ষা পদ্ধতি এমনভাবেই নিরূপিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে যাতে তা দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জীবনযাত্রাকে ছুঁয়ে যেতে পারে। নাগরিক-জীবনের সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালীর এই একাত্মতায় সে নিজে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা উন্নয়নমূলক কাজে তার অবদান রাখার পাশাপাশি একটি ন্যায়পরায়ণ ও সকলের সমান অধিকারের সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে। এর চেয়ে সুসংবদ্ধভাবে কি বিষয়টা কেউ উপস্থাপন করতে পারবে? শিক্ষানীতির রূপ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—(১) শিক্ষা হবে সকলের, (২) শিক্ষা এমন হবে যাতে ভারত বিশ্বে

এগিয়ে যেতে পারবে। (৩) অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে আরও সুষম ও নাগরিকের সমান অধিকারের সমাজ সৃষ্টির সহায়ক হবে। যখন সত্যিই কোনো বিষয় প্রসংসার দাবি রাখে তখন আমরা তা করতে পিছপা হই কেন? আমাদের মনোভাব আচরণ কি সব সময় নেতিবাচক হবে? কেবলই সমালেচনা আর বিরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের কোনো সমস্যা সমাধানের প্রয়াসকে সূতিকাগারেই মেরে ফেলবে? মনে করার কোনো কারণ নেই আমি হঠাৎ করে সরকার প্রকাশিত কোনো খসড়া দলিলের তুষ্টিকরণ করতে নেমেছি। অতীতে সরকারের তরফে প্রকাশিত বহু খসড়া দলিল দেখার সুবাদে এটিকে অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপিত কিন্তু সরাসরি সমস্যার মূলে পৌছতে নেমেছে বলেই আমার ধারণা। খসড়া দলিলটি সুন্দরভাবে tarmating করা হয়েছে এবং সকলের বোঝার উপযুক্ত ইংরেজিতে লেখা হয়েছে। এবারে খসড়াটির যে বিষয় নিয়ে সমালোচনা করে রাজনৈতিক ঝড় তোলা হয়েছে সেটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী এক জন ছাত্রকে তিনটি ভাষা আবশ্যিকভাবে শিখতে হবে। এগুলি হবে ইংরেজি, যেখানে পড়াশোনা করা হচ্ছে সেই আঞ্চলিক ভাষা (যেখানে স্কুল অবস্থিত) ও তিন নম্বরে রয়েছে যে কোনো আর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা। এর একটা কারণ ভারতের নানা ভাষার প্রসার ঘটানো। দ্বিতীয়ত ফলশ্রুতি হিসেবে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি। এছাড়া চাকরির ক্ষেত্রে এক রাজ্যের নাগরিক ভিন্ন রাজ্যে চাকরি সূত্রে গেলে যদি সেখানকার ভাষাটা আয়ত্তে থাকে তা বিরাট কাজ দেবে। ভবিষ্যৎ উন্নতির ক্ষেত্রেও এই বাড়তি ভাষাজ্ঞান সুবিধে করে দেবে।

উদাহরণ এরকম হতে পারে। দিল্লির এক ছাত্র ইংরেজি শিখছে, হিন্দি শিখছে, আবার সঙ্গে তৃতীয় ভাষা হিসেবে সে তামিল শিখতে পারে। চলতি শিক্ষা ব্যবস্থায় এটা ভাবাই যায় না। কিন্তু সত্যিই যদি একটি উত্তর ভারতীয় ছেলে তামিল শেখে বা একটি গুজরাটি মেয়ে বাঙ্গলা শেখে তা হবে অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাদের এই দক্ষতা তারা চাকুরি ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়োগকর্তাদের কাছেও তাদের গুরুত্ব বাড়বে।

কিন্তু একটা জায়গায় NEP-র একটু ভুল পা পড়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতে ভাষা-ফর্মূলা লাগু করার ক্ষেত্রে ইংরেজি যেমন থাকার থাকছে সঙ্গে স্থানীয় ভাষাটি তো আবশ্যিক বটেই তবে এর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি বাধ্যতামূলক। গণ্ডগোলটা এখানেই হল। হিন্দির কথা সরাসরি না বলে যদি অন্য যে কোনো ভারতীয় ভাষা বলে ছেড়ে দেওয়া হতো সেক্ষেত্রে হল্লা করার সুযোগ অনেক কমে যেত। উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে তৃতীয় ভাষাটি কিন্তু বাঁধাধরা নয়, সেখানে অসমীয় থেকে গুজরাটি হয়ে তামিল সবই নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু দক্ষিণে হিন্দির নামটি উচ্চারিত হয়ে গেল। দক্ষিণের লোক সর্বাঙ্গীণ সুবিধে পাওয়ার জন্য নিজেরাই হয়তো হিন্দিটিকে বেছে নিত।

তবে NEP কোনো বিধিবদ্ধ আইন নয়, তাই একে চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্নও উঠে না। তবুও দক্ষিণের লোকেদের হিন্দি শেখাটা দরকার। এই ধরনের লোকেদের হিন্দি শেখানো দরকার এই ধরনের কোনো ইচ্ছে জোর দিয়ে বলাটাই অবান্তর। এর ফলে দক্ষিণীদের অসন্তোষ বাড়ল, হিন্দি ভাষাকে খাটো করে দেখার সুযোগ তৈরি হলো। সর্বোপরি NEP এর সৎ উদ্দেশ্যও সন্দেহের মুখে পড়ল। তিন ভাষার প্রচলনের উদ্যোগ ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নয়। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বহু দশক ধরে এর প্রয়োগ করার চেষ্টাও চলে আসছে। কিন্তু প্রয়োগ প্রক্রিয়াটি সঠিক হয়নি। এখন যদি আমরা তিন ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রটিকে যথাযথভাবে ছাত্রোপযুক্ত করে তুলতে পারি তাহলে পড়ুয়ারাও অনায়াসে বুঝতে পারবে কোথায় তাদের সর্বাপেক্ষা বেশি সুবিধে হবে একই সঙ্গে তা দেশের পক্ষেও হিতকারী হবে।

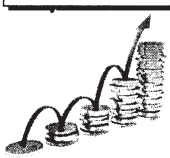
ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি একজন উদার ভারতীয়ের পক্ষে দক্ষিণের তামিলভাষা শেখা নিশ্চিতভাবে শুধু নম্বর বাড়াবার জন্য সংস্কৃত শেখার থেকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। শিক্ষা ব্যবস্থা বা ভাষা শিক্ষা উদ্দেশ্য নিয়ে অনাবশ্যক রাজনীতি করার কোনো প্রয়োজন নেই। NEP-কে পরিবর্তন পরিমার্জন করা যায়, করা উচিতও এবং একথা বলতে পারি যে তা করা হবেও। কিন্তু তা করতে গিয়ে আমরা ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাকেই সর্বোতোভাবে অগ্রাধিকার দেব। রাজনীতিকে কখনই নয়। ■

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)



২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

রম্যরচনা

শ্যামের লেজ

পশু চিকিৎসালয় বড়ো অদ্ভুত জায়গা। সেখানে গোরুর ডাক্তারকে বলা হয় ডাঃ গোরু, কুকুরের ডাক্তারকে বলা বলা হয় ডাঃ কুকুর। সেখানে কোনো পশুর চিকিৎসা করাতে গেলে মালিকের নাম রেজেস্ট্রি খাতায় তোলা হয়। এই সেদিন এক ভেটেরিনারি হসপিটালে গিয়েছিলাম আমার বন্ধুর সঙ্গে ওর পোষা কুকুরের চিকিৎসা করাতে। রেজেস্ট্রি খাতায় দেখলাম লেখা হলো, নাম— শ্যাম রজক। সমস্যা— লেজে ঘা।

* * *

প্রতিবন্ধী আম

সেদিন বাসে উঠে দেখি প্রতিবন্ধী সিটে একটা বস্তা রাখা আছে। সকলেই ভাবছে হয়তো কেউ সিট রেখে দিয়েছে। তাই সবাই দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচ-ছটা স্টপেজ যাবার পর ভিড় বেড়ে গেছে। সাবাই চিৎকার করছে— কার বস্তা, হঠান সিট থেকে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলে উঠল— 'আমার'। একজন বলল, আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বস্তাটা সিটে রেখেছেন কেন? লোকটি বলল, বস্তায় আম আছে, আর আমগুলো ল্যাংড়া।



উবাচ

"সন্ত্রাসবাদ তো সন্ত্রাসবাদই। এটি কখনো ডান-বাম হতে পারে না। সন্ত্রাবাদের বিরুদ্দে মোদী সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কোনো আপোশ হবে না।"



অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

লোকসভায় এনআইএ সংশোধনী বিল-১৯ প্রসঙ্গে

"একুশে জুলাই এখন আর শহিদ স্মরণ হয় না। হয় জলসা। সামনে লোকেদের বসিয়ে হলিউড-টলিউডকে এনে পাগলু ড্যানস হয়।"



মুকুল রায়
বিজেপি নেতা

২১ শে জুলাই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ

"কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দুদের ফিরিয়ে আনতে দায়বদ্ধ বিজেপি। ১৯৮৯ সালে জম্মু-কাশ্মীরে সশস্ত্র জেহাদি হামলায় ২ থেকে ৩ লক্ষ হিন্দু প্রাণভায়ে অন্যত্র পালিয়ে গেছেন। তাদের ফিরিয়ে আনা হবে নিজেদের ভিটেমাটিতে। তাদের পুনর্বাসনে নয়া প্রকল্প হাতে নিয়েছে কেন্দ্র সরকার।"



রামমাধব
বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা

কাশ্মীর থেকে উদ্বাস্তু হিন্দুদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে

"ভারতীয় সেনা দেশের সীমা রক্ষা করতে সক্ষম। তাই এতে সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, ভারতের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের দুঃসাহসের কড়া জবাব তারা দেবে। অনেক অসুবিধা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে ভারত কার্গিল যুদ্ধ জয় করেছিল। এজন্য আমাদের গর্ব করা উচিত।"



জেনারেল বিপিন রাওয়াত
ভারতের সেনা প্রধান

কার্গিল যুদ্ধের কুড়িবছর পূর্তি অনুষ্ঠানে

রাহুল গান্ধীর মতো ব্রিটিশ শাসকরাও ভারতীয়দের কুকুরের সমগোত্রীয় ভাবতেন

সাধন কুমার পাল

অবশেষে রাহুল গান্ধী পদত্যাগ করেই ফেললেন। ২০১৩ সালে কংগ্রেসের সহ-সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ৪৩টি নির্বাচনে লড়াই করে ৩৫টিতে পরাজিত হয়েছে। গান্ধী পরিবারের কেউ কোনোদিন যা করেনি, হাল আমলের নির্বাচনগুলিতে নতুন ভারতের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, সোনিয়া গান্ধীরা সেই সমস্ত কাজও করেছেন। মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছেন, গঙ্গায় স্নান করেছেন, যজ্ঞ করেছেন, ঘোমটা দিয়েছেন, কৈলাশ মানস সরোবর যাত্রা করে কট্টর শিবভক্ত সাজার চেষ্টা পর্যন্ত করেছেন। তবুও শেষ রক্ষে হয়নি। এই সমস্ত পরাজয়ের কোনোটাই তাঁরা যে মেনে নিতে পারছেন না তা রাহুল গান্ধীর পদত্যাগ পত্রের বয়ানেই পরিষ্কার। রাহুল লিখেছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ নেই। কিন্তু আর এস এস বিজেপি যে ভারত নির্মাণ করতে চাইছে তার জন্য প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি লড়বেন। ভারতের লোকতন্ত্র মূলগত ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখানে মিডিয়া, নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ কেউ নিরপেক্ষ ছিল না। ফলে নির্বাচন নিরপেক্ষ ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না। বলার অপেক্ষা রাখে না জনগণের রায়, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তার মাধ্যমে আসা পরিবর্তনের প্রতি রাহুল গান্ধীর মনে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে জন্ম নেওয়া হতাশা থেকেই এই পদত্যাগ। মনস্তত্ত্ব বলছে মাইন্ড সেটই ঘৃণা, বিদ্বেষ, হতাশার জন্মদাত্রী। সেজন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধীদের মাইন্ডসেট বিশ্লেষণ খুব জরুরি।

২১ জুন বিশ্ব যোগদিবস উপলক্ষে যখন সমগ্র বিশ্ব যোগাভ্যাসরত সে সময় রাহুল গান্ধী ভারতীয় সেনার ডগ স্কোয়াডের ছবি টুইট করেছেন। ছবির শিরোনামে লিখেছেন 'নিউ ইন্ডিয়া'। ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রশিক্ষকরা যোগাভ্যাস করার সময় যে সমস্ত পোজ নিচ্ছেন ঠিক একই রকম পোজ নিচ্ছে প্রশিক্ষিত সারমেয়রা। এই টুইট ঘিরে বিস্তর বিতর্ক হচ্ছে। কেউ বলছেন রাহুল গান্ধী যোগ অভ্যাসকারীদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে ভারতকে অপমান করেছেন, কেউ বলছেন এটা ভারতীয় সেনার অপমান, আবার কেউ এই টুইটকে প্রশিক্ষিত সারমেয়দের অপমান হিসেবে দেখেছেন। কার অপমান এই নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই টুইটের প্রভাব যে নেতিবাচক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে মাইন্ড সেট কী ধরনের হলে পরে ভারতের জন্য গৌরবসূচক একটি দিনে কোনো ভারতীয় এই ধরনের টুইট করতে পারে সেটি বিশ্লেষণ করা খুবই জরুরি। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের এক মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ধর্মনিরপেক্ষ শিবির থেকে যে সমস্ত কথা শোনা যাচ্ছে সেগুলি শুনতে শুনতে মানুষ ক্লান্ত। যেমন বলা হচ্ছে ইভিএমে কারচুপি করেই মোদী জয়ী হয়েছেন। আবার কেউ বলছেন হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করে মোদী জয় পেয়েছেন। আবার এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন এই নির্বাচনে পাটিগণিতের চেয়ে রসায়ন বেশি কাজ করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে কী সেই রসায়ন?

এই রসায়নের খোঁজ পেতে হলে প্রথমেই নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই নির্বাচনে এনডিএ-র অভূতপূর্ব বিজয়ের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী বলেন, 'দেশ আবার একবার স্থিতিশীল সরকার পেল। এটা কোটি কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য। এটা রাষ্ট্রীয় শক্তির বিজয়। লোকতন্ত্রের এই বিজয়যাত্রায় যাদের অবদান আছে তাদের সকলকে অভিনন্দন। বিশ্বের সামনে আরো একবার ভারতীয় লোকতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলো।'

আর এস এসের সহ-সরকার্যবাহ মনমোহন বৈদ্য বলেন, 'আসলে এই নির্বাচন ছিল ভারতের দুটো বিচারধারার লড়াই। একদিকে ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক একাত্ম, সর্বাঙ্গীণ সর্বসমাবেশক জীবন দৃষ্টি বা চিন্তন সমস্ত বিশ্ব যাকে হিন্দু জীবনদৃষ্টি বা হিন্দু চিন্তন, নামে চেনে। অন্যদিকে অভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি যা ভারতকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার সমষ্টি বলে মনে করে। নিজ নিজ স্বার্থের জন্য যারা সমাজকে জাতি, ভাষা, প্রদেশ ও ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে এসেছে। এই বিভাজনের রাজনীতিতে অভ্যস্ত শিবির নিরন্তর সেই শক্তির বিরোধিতা করে এসেছে যারা চিরকাল ভারতীয় সমাজকে এক ও অখণ্ড ভেবে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চায়। এই অখণ্ড ভাবনার বিরোধিতা করতে গিয়ে এই শিবির বিভিন্ন সময় ভিত্তিহীন মিথ্যে অভিযোগ এনে নিরন্তর ভুল ধারণা নির্মাণের প্রয়াস করেছে। স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকে চলতে থাকা এই বিচারধারার লড়াই এখন নির্ণায়ক স্তরে পৌঁছে গেছে। এই লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এই নির্বাচন। সমাজ এক ও অখণ্ড বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, ফলে বিভাজনের রাজনীতির প্রভাব ক্রমশই সঙ্কুচিত হচ্ছে। সে জন্য বিভাজনের নীতিতে বিশ্বাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে জোটবদ্ধ হয়ে এক ও অখণ্ডতার আদর্শে বিশ্বাসীদের মোকাবিলা করার প্রয়াস করেছে। ভারতের প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান মানুষ ঐক্যের পক্ষে ক্রিয়াশীল সর্বসমাবেশক ভারতকে সমর্থন করে সবার সঙ্গে সবার বিকাশের সূত্রকে জয়ী করেছে। ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এই জয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ভারতের জনগণ এই জয়ের জন্য ধন্যবাদের পাত্র। এই বৈচারিক লড়াইয়ে ভারতের পক্ষে থাকা মজবুত নেতৃত্ব এবং সমস্ত কার্যকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন।'

সঙ্ঘের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে এই নির্বাচন কোনো সাধারণ নির্বাচন নয় ভারতের পরিচয় প্রতিষ্ঠার লড়াই, দেশ হিসেবে ভারত নিয়ে দুটো নেরেটিভের লড়াই। একটি বিশেষ মাইন্ড সেট সম্পন্ন ভারতীয় সমাজ তৈরির উদ্দেশ্য নিয়েই

মেকলে সাহেব এদেশে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। বছরের পর বছর ধরে এই শিক্ষাব্যবস্থায় ভারত সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে এক হীনমন্যতা তৈরি হতে থাকে।

দেশ স্বাধীন হলেও মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার মূলগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীনতার সাত দশক পরেও ভারতে স্বাভিমানী ছাত্রসমাজ গড়ে উঠেনি। ফলে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে এখনো টুকরে টুকরে গ্যাং ভারত বিরোধী স্লোগান তুলতে সাহস পায়। মানব সভ্যতার বিকাশে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, জীবন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভারতের অবদানকে তুলে ধরার এবং ভারতীয় ভাবনায় ভারতকে গড়ে তোলার সার্বিক কোনো প্রয়াস হয়নি। যারাই ভারতকে, ভারতীয়ত্বকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে বা তাদের কপালে জুটেছে প্রাচীনপন্থী, পশ্চাৎপদ তকমা। এতদিন তো ব্রিটিশ প্রভুদের তৈরি করা মাইন্ড সেট অনুসারে ভারতীয় জীবন পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যোগ, ধ্যান, আসন, প্রাণায়ামকে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বলে মনে করাটাই ছিল আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা। দেশের বামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষতার ঢ্যাড়া পিটাতে অভ্যস্ত প্রায় সিংহভাগ নেতা-নেত্রী যোগ সম্পর্কে এই ধরনের বিকৃত মানসিকতার শিকার। নাগাল্যান্ড মণিপুরে চার্চের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা এখনো ভারতীয়দের 'ইন্ডিয়ান ডগ' বলে সম্বোধন করে থাকে। সন্দেহ নেই যে রাহুল গান্ধী ঠিক এই ধরনের মাইন্ডসেট থেকেই বিশ্ব যোগ দিবসে ডগস্কোয়াডের ছবি টুইট করে যোগদিবস উদযাপনাকারীদের কটাক্ষ করেছেন।

কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। রিপোর্ট বলছে শুধুমাত্র ভারতের গ্রাম-শহর-পাড়া-মহল্লা নয় ২১ জুন যোগদিবস উপলক্ষে বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশ যোগচর্চায় মেতে উঠেছিল। সৌদি আরবের মতো ইসলামিক দেশও আছে যারা নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যোগশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে বা করার পরিকল্পনা করছে। বিশ্বের উন্নতদেশগুলিতে ভারতীয় জীবনচর্চা জনপ্রিয় হচ্ছে। বিশ্বযোগ দিবস অর্থাৎ ভারতীয় জীবনচর্চার গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বের দরবারে ভারতকে নতুন করে সমীহ আদায় করতে সহায়তা করছে। বিদেশ সফরে গেলে ভারতের প্রতিদিনের দলীয় রাজনীতি থেকে অনেক দূরে অনাবাসী ভারতীয়দের প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে ধরে উচ্চৈঃস্বরে ভারতমাতা কী জয়, বন্দে মাতরম্, জয় শ্রীরাম স্লোগানের উচ্ছ্বাস আমরা দেখেছি। ভারতকে নিয়ে এ যেন এক নতুন উচ্ছ্বাস, নতুন উদ্দীপনা। অনাবাসীদের মুখে এই ধরনের স্লোগানগুলিতে নিশ্চয়ই ভারতের অন্তরাত্মার ছোঁয়া আছে, না হলে অনাবাসীরা কোন স্বার্থে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে এই ধরনের ধ্বনি দেবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে এতদিন এই দৃশ্য দেখা যায়নি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরও সহজ। এতদিন ভারতকে তুলে ধরার প্রয়াস হয়নি। এতদিন যারা দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মনে এই ভাবনা কখনোই আসেনি যে ভারতের নিজস্ব ভাবনাতেই ভারত ঘুরে দাঁড়াতে পারে। ভারত বিশ্বকে অনেক কিছুই দিতে পারে। বিশ্বগুরুর আসনে বসাতে পারে। শুধু এই মাইন্ডসেট নিয়ে দেশ পরিচালনা করা হয়েছে যে ভারত পিছিয়ে পড়া উন্নয়নশীল দেশ, সবার সাহায্য নিয়ে ভারতকে উন্নত হতে হবে। ২০১৫ সালে বিশ্বযোগ দিবসের স্বীকৃতির মাধ্যমেই নব ভারতের এই উত্থানের আনুষ্ঠানিক সূচনা বলা যেতে পারে। ফলে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে অনাবাসীরাও এখন যে সমস্ত স্লোগান তুলছেন সেগুলিকে ভারতের জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ অন্তরাত্মার আওয়াজ বলা যেতে পারে। রাহুল গান্ধীর মতো তথাকথিত প্রগতিশীলরা নতুন ভারতকে মেনে না নিয়ে যদি সেই পুরানো মাইন্ডসেট নিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে যে ক্রমশই পিছিয়ে পড়বেন ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবেন সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলির ফলাফলেই তা স্পষ্ট।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইংরেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই জওহরলাল নেহরুর ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছিল। স্বামীজীর ভাষায় বললে বলতে হবে নেহরুর ভারতে পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা...এই মাত্র সম্বলে' ভারত উচ্চাধিকার লাভের স্বপ্ন দেখতো। নেহরুর ভারতে রাষ্ট্রপ্রধান হতে গেলে বিদেশি ডিগ্রি, উচ্চবংশ, ধনাঢ্য হওয়া অলিখিত অনিবার্য নিয়ম ছিল। ফলে এক সময় এমন ছিল যে গান্ধী পরিবারের বাইরে কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাতে পারে এটা নিরক্ষরতা ও দারিদ্রতার ফাঁসে ফেঁসে থাকা ভারতের মানুষ ভাবতেই পারতো না। সাত ও আটের দশক পর্যন্ত এটাই ছিল ভারতের রাজনৈতিক ধারা। নয়ের দশক থেকে শুরু হয় জাতপাতের রাজনীতির উত্থান। বিশেষ করে বিহার উত্তরপ্রদেশের মানুষ জাতপাতের রাজনীতির মধ্যেই নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে পায়। MY ফ্যাক্টর (মুসলমান-যাদব ভোটব্যাঙ্ক) লালু যাদবকে এতটাই শক্তিশালী করে তুলল যে সে সময় স্লোগান উঠলো 'যবতক সমোসামে আলু, জঙ্গলমে ভালু হোগা তবতক বিহার মে লালু রহেগা'। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন প্রায় নিরক্ষর রাবড়ি দেবীকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়েও অক্লেশে বিহারকে শাসন করতে সে সময়ের সুপারস্টার লালু যাদবের কোনো সমস্যাই হয়নি। জাতপাতের রাজনীতি বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতাকে এতটাই শক্তিশালী করে তোলে যে মুলায়েম সিংহ যাদব, মায়াবতীর মতো নেতা-নেত্রীরাও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। এদিকে সময়ের সঙ্গে ভারতের নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের হার কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারতান্ত্রিক ও জাতপাতের রাজনীতির উপর থেকে মোহ মুক্তি ঘটতে শুরু করে ভারতীয় ভোটারদের। যার প্রতিফলন দেখা যায় ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বলছে ভারতীয় ভোটাররা পরিবারতান্ত্রিক ও জাতপাতের রাজনীতির ফাঁদে আর পা দিতে নারাজ। একদা MY ফ্যাক্টরে বলিয়ান লালু যাদব এবার বিহারে খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়ে হতাশায় ভুগছেন। জোটবেঁধে নির্বাচনে লড়েও অখিলেশ-মায়াবতী প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারলেন না। ক্ষমতাসীন থেকেও রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা নিজেদের পুত্রদের জেতাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

রাহুল গান্ধী ও জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া নিজেদের পারিবারিক লোকসভা কেন্দ্র বলে পরিচিত যথাক্রমে আমেথি ও গুনা থেকে জয়ী হতে পারলেন না। পরিবারতন্ত্র, জাতপাত, দলিত, সংখ্যালঘু নামক এক সময়ের দুর্দান্ত টনিক এখন ভারতীয় রাজনীতিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ রসায়ন মাত্র। এই রসায়ন না বদলালে, নতুন ভারতের তালে তালে মিলিয়ে চলতে না পারলে বিরোধীদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব যে আরও সঙ্কটাপন্ন হবে এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ▮



রজত জয়ন্তী বর্ষে সারদা বিদ্যামন্দির

ড. বৃন্দাবন ঘোষ

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ভারতীয় ভাবধারায় ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক ড. রাজেন্দ্র সিংহের অনুপ্রেরণায় সুদর্শন ভট্টাচার্য, অঞ্চল কুমার বোস, রাধাকৃষ্ণ মুন্দ্রা, সোহনলাল ঝাওয়ার, উৎপলেন্দু সরকার, গোপেশ চন্দ্র সরকার, মহাবীর চাঁদ কাঙ্কারিয়া,, সুজন পাল, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, শ্যামল পাল, গোবিন্দ ঘোষ প্রমুখ সমাজসেবীর উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে ১ মে রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুরে সারদা শিশুতীর্থের কয়েকটি কক্ষে অস্থায়ী ভাবে সারদা বিদ্যামন্দিরের শুভ উদ্বোধন ঘটে।

১ মে ছুটির দিনে অভিভাবক-অভিভাবিকরা উপস্থিত থাকতে পারবেন বলে ওই দিনটিকে শুরুর দিন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। সেদিন সকালে অঙ্কুর, কিশলয়, ওয়ান এবং ফাইভ এই চারটি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়েছিল। ওই শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল একশো তিনজন। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা। তখন প্রিন্সিপাল পদে অরূপ সরকার, আচার্যের পদে সুব্রত সরকার, প্রণতি দে, অর্চনা সাহা, অপূর্ব কুমার দাস, রাজবলী পাল প্রমুখ এবং সেবিকার পদে অঞ্জনা চৌধুরী যোগদান করেন।

১৯৯৫ সালে সুনীল কুণ্ডু চলাচলের রাস্তা এবং বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি দান করেন। ওই বছরেই শৈলেন্দ্র নারায়ণ সেন বিদ্যালয়ের ঘর নির্মাণের জন্য চন্দোর মৌজায় পঞ্চাশ শতক জমি দান করেন। সেই জমিতে পশ্চিম মুখী প্রথম পাঁচটি ঘর গড়ে তোলা হয়। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে এই বিদ্যালয়কে তার নিজস্ব (বর্তমান স্কুল প্রাঙ্গণে) ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে সুনীল কুণ্ডু, মানিক চক্রবর্তী ও শেফালি চৌধুরী প্রমুখ অতি স্বল্প মূল্যে কিছু জমি দেন। বর্তমানে বিদ্যালয়ের পরিসর সাঁইত্রিশ বিঘে জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। তবে অধিকাংশ জমি প্রতিষ্ঠান নিজে ক্রয় করে।

সেখানে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণমুখী ইউ আকৃতির ত্রিতল ভবন গড়ে ওঠেছে। দ্বিতল ও ত্রিতলের ভবনগুলির সঙ্গে দুটি ঝুলন্ত পথ সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। সেখানে পঁয়ষট্টিটি কক্ষ ও একটি বড়ো সভাকক্ষ রয়েছে এবং মহাপুরুষদের নামে কক্ষের নামকরণ করা হয়েছে। চার দিকে সীমানা প্রাচীরও গড়ে ওঠেছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অশ্বত্থ, আমলকি, বট, পাকুড়, কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু, বকুল, আম, কাঁঠাল, লিচুর গাছ এবং বনজঙ্গলে মোড়া কৃত্রিম পাহাড়ে এস.ভি.এম. লেখা দেখে মন জুড়াবে। তার মাঝে শিশুরা জিরাফ আকৃতির স্লিপারে, ঘূর্ণি চেয়ারে ও দোলনায় উঠে মনের আনন্দে খেলাধুলো করতে থাকে।

২০০৫ সালে দিল্লির কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে এই বিদ্যালয় ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত পঠন পাঠনের (এ.এফ.এফ. নং ২৪৩০০৭৫, এস.সি.এইচ. কোড- ৫৬০০৫) অনুমতি লাভ করে। ২০০৭ সালে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগেরও

অনুমতি পায়। তবে বর্তমানে সেখানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। উন্নত মানের পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যার পরীক্ষাগার গড়ে উঠেছে। বিদ্যালয়ে বিপদ আপদের জন্য ভবনের মাঝে ও দুই প্রান্তে তিনটি সিঁড়ি, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং লোডশেডিংয়ের সময় জেনারেটর ব্যবস্থা চালু আছে। ২০১১ সালে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস নামে একটি ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রভাত ও দিবা দুটি বিভাগে পঠনপাঠন চলে। ২০১৮ সাল থেকে প্রভাত বিভাগ চালু হয়। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৬১৭ জন। সাধারণত অরুণ ও উদয় এই দুটি শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হয়। তপশিলি জাতি ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও পড়াশুনা করে। তবে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সাধারণ সমাজের। রায়গঞ্জ শহরের অধিকাংশ শিক্ষক, ডাক্তার ও ব্যবসায়ীদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করতে দেখা যায়। করণদীঘি, ইটাহার, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। বিদ্যালয়ের ছোটো বড়ো ষোলটি বাসে প্রায় চল্লিশ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী আসা যাওয়া করে এবং বাকিরা নিজেদের যানবাহনে যাতায়াত করে। বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের পোশাক নীল সাদা রঙের। শীতকালে লাল রঙের সোয়াটার ও মাফলার।

এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পঁয়ষট্টি জন শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠদান করেন। কেরল, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা রয়েছেন। এঁরা অধিকাংশ এম.এ./এম.এসসি এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। মাঝে মধ্যে তাঁদেরকে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিক্ষকদের সাদা ধুতি পাঞ্জাবি এবং শিক্ষিকাদের লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরতে হয়। আধুনিক যুগে ওই পোশাক শহরবাসীকেও আকৃষ্ট করে। এরা সকলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে স্যার ও ম্যাম বলে পরিচিত। তবে পূর্বে এরা দাদাভাই ও দিদিভাই বলেই পরিচিত ছিলেন। সেখানে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে বারোজন অশিক্ষক কর্মী কাজ করেন। বিদ্যালয়ের সকল স্থায়ী কর্মীর পি.এফ. আছে এবং তাঁদেরকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বেতন দেওয়া হয়।

প্রতিদিন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে মাতৃবন্দনার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় শুরু এবং জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। প্রার্থনার সময় ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা কারও পায়ে জুতো থাকে না। সকলে জুতো খুলে অধ্যক্ষ ও সহ অধ্যক্ষের ঘরে প্রবেশ করেন। যোগানুশীলন, শারীর শিক্ষা, সংগীত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এই পাঁচটি বিষয়ের উপর নজর দিয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। তার ফলে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মে, দেশাত্মবোধ গড়ে ওঠে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হয়।

বিদ্যাভারতীর শিক্ষানীতি সময় সময় গ্রহণ করা হয়। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষিকারা চিত্র প্রদর্শন, প্লেওয়ে, ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তাঁরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অভিভাবক অভিভাবিকাদের সঙ্গে পঠন পাঠন সম্পর্কে আলোচনা করে সুপরামর্শ দেন। তার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে জটিল বিষয়গুলি সহজ থেকে সহজতর হয় এবং শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অভিভাবিকাদের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এই বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম দিকে অমিত আগরওয়াল, ঈশা আগরওয়াল, নীতেশ কুমার সাহা, মিহির কুমার ঝা, দীপ্তা চৌধুরী, অরিত্র ব্যানার্জী-সহ বহু ছাত্র-ছাত্রী উল্লেখযোগ্য ফলাফল করে এই প্রতিষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করে চলেছে। রাকা মিত্র ন্যাশনাল চিলড্রেন সায়েন্স কংগ্রেস প্রতিযোগিতায় রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নির্বাচিত হয় এবং গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী অন্তরা চক্রবর্তী ক্রীড়ায়, ডালিয়া চন্দ, শিউলি সরকার নৃত্যে এবং মৃন্ময়ী সরকার, উত্তরা ব্যানার্জি সংগীতে বিশেষ সুনাম অর্জন করে।

এই বিদ্যালয়ে পাঠদানের পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জাতীয় উৎসব পালন, বনভোজন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, অভিভাবক অভিভাবিকা সম্মেলন, সায়েন্স সেমিনার, সমারোহের সঙ্গে সরস্বতী পুজোর আয়োজন ইত্যাদি করা হয়। অধিকাংশ সময় সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে থাকেন। বিদ্যালয়ের পূর্ব দিকের মাঠে ওই খেলা চলে। বনভোজনে ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অভিভাবক অভিভাবিকারাও যোগ দেন। শিক্ষামূলক ভ্রমণে তারা চা বাগান, বাণগড়, গৌড়, হাজার দুয়ারি এমনকী ২০০৪ সালে ভারত- পাকিস্তান ওয়াঘা বর্ডার পরিদর্শন করে।

সারদা সেবা ট্রাস্ট এই বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকে। এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদকের পদে আসীন হয়েছেন উৎপলেন্দু সরকার, মহাবীর চাঁদ কাঙ্কারিয়া, অমরেশ কুমার মুন্দ্রা। অরূপ সরকার, রাজবলী পাল, রাজেশ কুমার ভার্মা, সৌমেন রায়, ধ্রুবজ্যোতি অধিকারী প্রধান আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। এদের সকলের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যোগগুরু রামদেব বাবা, সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী, বিদ্যাভারতীর আধিকারিক কৃষ্ণ চন্দ্র গান্ধী এবং বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এখানে এসেছেন।

গত ১ জুন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক উৎপলেন্দু সরকার। তিনি ওই অনুষ্ঠানে রজত জয়ন্তী বর্ষের সদস্যদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাস তুলে ধরেন। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ভবন সংস্কার, গ্রাম পরিদর্শন, বৃক্ষরোপণ, নিঃশুল্ক পাঠদান কেন্দ্র, রক্তদান শিবির, সেবক সেবিকাদের ও বিশিষ্ট জনদের সম্মান জ্ঞাপন, স্মরণিকা প্রকাশ, শিক্ষামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের ১ মে পর্যন্ত রজত জয়ন্তী উৎসব চলবে। এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষজনের আগমন ঘটবে, ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের প্রতিভার বিকাশ ঘটবে এবং এলাকাবাসীর চিত্ত বিনোদনের সুযোগ মিলবে। ■

রাজ্য রাজনীতি

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে রাজ্যে কোনভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শহিদ হতে দেওয়া যাবে না

সুজিত রায়

কেমন আছে পশ্চিমবঙ্গ?

লোকসভা ভোটের আগে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরের সময়টুকুতে মানুষের উত্তর ছিল—ভালো নেই। গণতন্ত্র বিপন্ন। মানুষ বিপন্ন।

২০১৯-এর লোকসভা ভোট মিটে গেছে সরাসরি কেন্দ্রীয় অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর কঠিন প্রহরায়। এখন কেমন আছে পশ্চিমবঙ্গ? উত্তর সেই একই—ভালো নেই। বরং আগের তুলনায় সমস্বরে মানুষের হাহাকারের তীব্রতা অনেক বেশি। এখন এ রাজ্যে শুধু গণতন্ত্রই বিপন্ন নয়, বিপন্ন সংবিধানও। বিপন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র এবং দূরাগত হলেও এ লক্ষণ বেশ স্পষ্ট যে রাজ্যে রাষ্ট্রদোহের বীজও বোধহয় অঙ্কুরিত হতে চলেছে যেখান থেকে হয়তো একদিন দাবি উঠবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের 'বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালিকে বাঁচানো'র স্লোগান তুলে।

সকাল-দুপর-বিকেল-রাত—গোটা দিন এ রাজ্যের প্রতিটা জেলার প্রতিটি এলাকা তটস্থ কখন কী হয়ে যায়। বোমাবর্ষণ, গুলি চালনা, বাড়িতে আগুন লাগানো—এসব তো জলভাত। দিনদুপুরে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে মারা হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে। লোকসভা ভোটে জনগণ মুখ ফিরিয়ে নিলেও শাসকদলের এখনও লক্ষ্য রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করে তোলা। তাই টার্গেট শুধু বিজেপি নয়, সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসও। ২০০৯-১০ সালে বামফ্রন্ট প্রশাসনের অন্তিম লগ্নে রাজ্য যেমন পৌঁছে গিয়েছিল অরাজকতার শিখরে, এখনও রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিটা ঠিক তেমনই। শুধু রাজনীতিই নয়, প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে চরম অস্থিরতা, মাৎস্যন্যায় চলছে। একটা রাজ্যে সাতদিন ধরে সমস্ত সরকারি হাসপাতাল বন্ধ থেকেছে—এমন নজির আছে নাকি ভারতবর্ষে? পথ দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। প্রশাসনের হুমকি, পুলিশের উৎপীড়ন, শাসকদলের সরাসরি অত্যাচারের মুখে জনগণের প্রশ্ন—এরপরও কি রাজ্য এভাবেই চলবে না কি জারি হবে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা? সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসনে চলে যাবে পশ্চিমবঙ্গ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে দেখে নেওয়া যাক সংবিধানগত পদ্ধতি অনুসারে কখন একটি রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রথমত, রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হবে তখনই যখন কোনো রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

দ্বিতীয়ত, এই কঠোর আইন প্রয়োগ করা হবে, যদি রাজ্য সরকারের প্রশাসনের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, যদি কোনো রাজ্য সরকার জাতীয় সংহতি বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় এবং পৃথক সার্বভৌত্বের দাবি করে, তাহলে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

চতুর্থত, যদি কোনো রাজ্য প্রশাসন রাজ্যের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদপন্থা সৃষ্টি করে এবং সংবিধানকে অমান্য করে রাজ্যের গণতান্ত্রিক সামাজিক অনুশাসনকে ভঙ্গুর করে তুলতে চায়, তাহলেও সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সংবিধানের এই সূত্রগুলি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের এখন যে অবস্থা, তাতে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রয়োগ করার পূর্ণ সমর্থনযোগ্য পরিবেশ রয়েছে। খুনখারাপি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিরোধী দলগুলিকে হেনস্তা করা এসব তো আছেই। দেশদ্রোহ বা রাজ্যের জনসংহতি নষ্ট করার প্রবণতাও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে স্পষ্টতই বিদ্যমান। হিন্দু-মুসলমান বিভাজন, বাঙ্গালি-বিহারি বিভাজন, পাহাড়ি জনজাতি বিভাজন, বনবাসী-জনজাতি বিভাজন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন—তিনি কোন পথে এগোবেন। তাছাড়া, ২০১১ সাল থেকেই বাংলা বাঁচাও বাঙ্গালি বাঁচাও স্লোগান তুলে একদল মানুষ কারণে অকারণে রাজপথে মিছিল বের করে। বিভ্রান্তি ছড়ায়। মানুষকে ভুল বোঝায়। এমনকী স্বপ্ন দেখায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ফের এক হবে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত জনগণ জানে ওই গোষ্ঠীর পিছনেও শাসকদলের আশীর্বাদ আছে। কারণ



শক্তপোক্ত দেওয়ালের পলেস্তারা ধসে পড়ার মতো একটা দুটো করে বিধায়ক কমছে তৃণমূলের। কারণ তাঁরা বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন। সেজন্য একটু সময় নেওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, তারা খসা এখন চলতেই থাকবে।

গোটা দেশটাকেই নড়বড়ে করে দেওয়ার জন্য এর চেয়ে বড়ো অস্ত্র আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু তবুও মনে রাখা দরকার একটি গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে এই সমস্ত সূত্রগুলো যতই সত্য হোক না কেন, চরম অনুশাসন প্রয়োগের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাও ভালভাবে অনুধাবন করে নেওয়া জরুরি।

এরাজ্যে মানুষ এখন শাসকদল এবং সরকার বিরোধী। সবাই না হলেও বেশিরভাগ মানুষই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এখনও ৪৩ শতাংশ ভোট রয়েছে শাসকদলের জিম্মায়। সুতরাং ৩৫৬ ধারা হঠাৎ প্রয়োগ বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অত্যন্ত কৌশলী রাজনীতিবিদ প্রয়োজনে আবার ঘন ঘন মিথ্যে কথা এবং রাজ্যের মানুষের মন ভেজানো কথা বলে সহানুভূতির ভোটে জিতে যেতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, বিজেপির উত্থান হয়েছে অতি সম্প্রতি। এরাজ্যে দলের ভোট এখনও ৪০ শতাংশ হলেও মনে রাখতে হবে এই ভোটের একটা অংশ এসেছে সিপিআই(এম) থেকে এবং কিছুটা এসেছে কংগ্রেস থেকে। এই ভোটগুলো যে কোনোসময় ঘুরে যেতে পারে কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম)-এর দিকেই। সুতরাং দলের ভোটব্যাঙ্ককে আরও মজবুত না করা পর্যন্ত ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ হবে চরম মূর্খামি।

তৃতীয়ত, সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে রাজ্যকে রক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারেরও কিছু কর্তব্য রয়েছে। সুতরাং ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের আগে কেন্দ্রকেও নিশ্চিত হতে হবে যে তাদের দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন। চতুর্থত, তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে দলছুট যারা সরাসরি বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন, তাদেরও বেশ কিছুদিন পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন। তৃণমূল কংগ্রেসের 'চর' হিসেবে কেউ কেউ যে আসছেন না, তা জোর করে বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে বিজেপি-র অভ্যন্তরীণ তথ্যাদি পৌঁছে যাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে যা কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

এই সঙ্গে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ এখন আর আইনি পর্যালোচনার বহির্ভূত বিষয় নয়। ১৯৯৪ সালেই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, কোন রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আগে, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের সুযোগ দিতে হবে। এরাজ্যে নতুন বিধানসভা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৃণমূল কংগ্রেসেরই রয়েছে। যদিও শক্তপোক্ত দেওয়ালের পলেস্তারা ধসে পড়ার মতো একটা দুটো করে বিধায়ক কমছে তৃণমূলের। কারণ তাঁরা বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন।. সেজন্য একটু সময় নেওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, তারা খসা এখন চলতেই থাকবে। সুতরাং এমনটা হওয়াও আশ্চর্যজনক নয় যে তৃণমূল কংগ্রেস দলটিই আরও কয়েকমাসের মধ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে একদা নব কংগ্রেসের মতো নব তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হবে এবং বিজেপি-র সঙ্গে হাত মেলাবে।

সুতরাং রেকর্ড ভোটে পর পর দুবার জয়ী হওয়া একটা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আগে দু'বার ভাবা দরকার। এটাও মনে রাখা দরকার, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র ব্যাপক উত্থান এবং চরম তৃণমূল বিরোধিতার মধ্যেও সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক উজার করে ভোট দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের কোনো কোনো লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল বিরোধী প্রবণতা দেখালেও, বিজেপি-কে ওই ভোটব্যাঙ্ক কবজা করতে এখনও অনেক লড়াই করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে তাই নিজেদের শেকড় শক্ত করতে বিজেপি-কে আরও একটু সময় নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবশ্যই এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ। পশ্চিমবঙ্গে এর আগেও চারবার (জরুরি অবস্থা বাদে) রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়েছে। এরমধ্যে তিনবারই ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। কোনোবারেই ফল কেন্দ্রের পক্ষে যায়নি। সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ভিমরাও আম্বেদকর নিজেই ৩৫৬ ধারাকে Dead Letter হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। অর্থাৎ যতটা কম ব্যবহার করা যায়, ততটাই মঙ্গল।

এবারেও যদি সমস্ত পরিস্থিতি ৩৫৬ ধারার অনুকূলে থাকেও তাহলেও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেই এগোতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছুতেই শহিদ হতে দেওয়া যাবে না। সময় তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি গ্রাস করে ফেলবে। ▮

বিশেষ সংখ্যা

নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় ইনিংস

এবার লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপির কল্পনাতীত সাফল্য। মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ পরপর দু'বার দিল্লির মসনদে আসীন। এবারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেন আরও বেশি জনপ্রিয়, আরও বেশি দৃঢ়সংকল্পিত।

মোদী ঝড়ে ধূলিস্যাত হয়েছে সমস্ত বিরোধিতা ও বিরোধীরা। একি শুধুই 'মোদী' নামের জাদু নাকি গত পাঁচ বছরের তাঁর কাজকে কষ্টিপাথরে পরখ করেই এই বিপুল জনসমর্থন!

নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকারের এই সাফল্যের বিভিন্ন দিক নিয়েই থাকবে বিশেষ কয়েকটি লেখা।

প্রকাশিত হবে ২৯ জুলাই '১৯।। সত্বর কপি বুক করুন।



মূল্য ১২ টাকা

চিঠিপত্র

এক দেশ এক ভোট

এক দেশ এক ভোটের বিরোধিতা করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। কারণ একাধিকবার ভোট হলে একাধিক ডেড বডি পড়বে। একাধিকবার রাজনৈতিক দাঙ্গা লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করবে। এতে উনি রাজনৈতিক দাঙ্গাশ্রী খেতাব অর্জন করতে পারতেন। প্রতি বছর ভোট হলে প্রতি ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু তোষণ করতে উনি উঠে পড়ে লাগবেন। শুধু তাই নয়, তাঁর হিজাব পরা ভেকধারী রূপ যাতে সংখ্যালঘুরা আত্মস্থ করে তাঁর সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে পারে; এক দেশ এক ভোট হলে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। আর ভাই ভাইপোরা এতদিন ধরে একাধিক ভোটের মাধ্যমে যে সরকারি টাকা লুঠ করে মেদ বাগিয়েছেন তা কি সহজে হাতছাড়া করা যায়! ভোটের খরচা বাবদ কেন্দ্র বা রাজ্য বিপুল পরিমাণ টাকা বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে অনুমোদন করে, যেহেতু সেই টাকার কোনো অডিট হয় না; ফলত ওই টাকা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক থেকে শাসক দলের নেতাদের হস্তগত হয় বৈকি! কিন্তু এক দেশ এক ভোট হলে এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে।

তাছাড়া বঙ্গ কর্মসংস্কৃতি তো উনি কবেই লাটে উঠিয়েছেন। একাধিক বার ভোট হলে সেই কর্মসংস্কৃতি আরও ভোগে পাঠাতে সুবিধে ওনার। ভোটের সময় কয়েক মাস যাবত উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যায়। একাধিক বার ভোট হলে আরও বেশি মাস উন্নয়ন স্তব্ধ হবে। ফলে ভাই ভাইপোদের উন্নয়নের টাকা মারতে সুবিধে হবে। একাধিক বার ভোট হলে জনগণের ভোটের সময় মাসাধিক কাল জুড়ে সরকারি পরিষেবা পাওয়ার জন্য চূড়ান্ত হেনস্থা হতে হয়। যদিও উনি জনগণেশকে নামমাত্র উপঢৌকনের লোভ দেখিয়ে হেনস্থা করতেই ভালোবাসেন। একাধিক বার ভোট হলে সেই ভোটের টোপ দেখিয়ে মেলা খেলা উৎসবের মাধ্যমে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করে হরির লুট ছড়িয়ে রাজকোষের ভাঁড়ার শূন্য করতে ও রাজ্যকে ঋণগ্রস্ত করে দেউলিয়া বানাতে ওনার জুড়ি মেলা ভার। তাই এই বিষয়গুলি যথার্থতার সহিত সুবিবেচনার মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের উচিত যথাশীঘ্র সম্ভব এক দেশ এক ভোটের আইন তৈরি করে সারা ভারত জুড়ে প্রয়োগ করা। লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন যেমন একসঙ্গে করা তেমনি সম্ভব হলে পঞ্চায়েত ও পুরভোট একসঙ্গে করা। কিংবা পঞ্চায়েত ভোট ও পুরভোট না করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রশাসক হিসেবে পঞ্চায়েত বা পৌরসভার মাথায় বসানো। এতে দেশের জাতির সমষ্টি উন্নয়ন আরও গতি পাবে।

—**সৌম্যজ্যোতি মাইতি,**
সিঙ্গুর, হুগলী।

হিন্দুধর্মে গণতন্ত্র

মুসলমানদের কোরানে যেমন একমাত্র নিরাকার আল্লা ছাড়া আর কাউকে উপাসনা করার অনুমতি দেওয়া নেই, খ্রিস্টানদের বাইবেলে যেমন একমাত্র গড আর যিশুখ্রিস্ট ছাড়া আর কারো পূজা করার অনুমতি নেই, হিন্দুদের শাস্ত্রে কিন্তু এরকম বাধ্যতামূলক কোনো ব্যাপার নেই। গণতন্ত্রে যেমন নিজের ইচ্ছা, প্রবণতা, সুবিধা ও পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে একাধিক বিষয়ের মধ্য থেকে বিশেষ কাউকে নির্বাচিত করা যায় হিন্দু ধর্মেও সেইরকম। হিন্দুরা রাধা-কৃষ্ণকে ইস্ট দেব-দেবী রূপে নির্বাচিত করতে পারেন। তা না হলে মা কালী, শিব, গণেশ, মা দুর্গা, শ্রীরামচন্দ্র, হনুমানজী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, মা মনসা ইত্যাদির মধ্যে যে কোনো একটি বা একাধিক দেব-দেবীকে হিন্দুরা পূজা করতে পারেন। দেব-দেবীতে আগ্রহ বা বিশ্বাস না থাকলে হিন্দুরা নিরাকার পরমব্রহ্মকে, সূর্যকে, কোনো সিদ্ধ গুরুদেবকে অথবা নিজের মা-বাবাকেও আরাধনা করতে পারেন। গীতাশাস্ত্রে কর্মযোগ নামে একটা আলাদা অধ্যায়ই রয়েছে। সামবেদের নানা শাখায় গন্ধর্ব বিদ্যা রয়েছে। তাতে নৃত্য, গীত, চিত্র, ভাস্কর্য, অভিনয় এইসব কলাবিদ্যা বা আর্টের চর্চাকেও পরম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজেই পূজা না করে বা অল্প স্বল্প পূজা করে হিন্দুরা মানুষের সেবা করা, আর্ট-কালচার নিয়ে থাকা, পশু পাখি উদ্ভিদ ও পরিবেশের সেবা রূপ ধর্মও পালন করতে পারেন। ইসলাম অনুযায়ী মুসলমান মাত্রই আল্লার বান্দা বা দাস। এছাড়া অন্য কোনো ভাবধারা ইসলামে নেই। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী হিন্দুরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সন্তানরূপে, বন্ধুরূপে, কৃষ্ণের দাস ভেবে, আরাধনা করতে পারেন। আল্লা ছাড়া আর কারো গান ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ। ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, নৃত্য অভিনয় এসবও ইসলামে হারাম। কিন্তু হিন্দুধর্মে গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী এসবকেও সাধনার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। হিন্দুদের যে কোনো পূজার আগে গণেশ, গুরুদেব, সূর্যদেব, অগ্নিদেব, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ইত্যাদিগের স্মরণ করতে হয়। নিজের সম্প্রদায়ের ইস্টদেবে-দেবী ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের দেব-দেবীদের স্মরণ করার ব্যবস্থা থাকায় হিন্দুদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক হওয়া সম্ভব হয় না। সবাইকে মান্য করাটা হিন্দুধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু ইসলামে বলা আছে যে, যারা মূর্তি পূজা করে তারা সব কাফের। নিরাকার আল্লা ছাড়া তোমরা আর কাউকে মেন না। খ্রিস্টানদের মধ্যেও গড আর যিশু ছাড়া আর কাউকে যারা মানে তাদের হেদেন, নাটিভ, পেগান ইত্যাদি বলে ছোটো করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে জন্মগত ভাবেই সুন্দর বিগ্রহ প্রতিমাকে শ্রদ্ধা দেখানোর প্রবণতা আছে। সুন্দর প্রতিমার মধ্যে যে আর্ট থাকে তাকে ইসলামে অস্বীকার করে পুতুল পূজা বলে ছোটো করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু মুসলমান খ্রিস্টানই কীর্তনের আসরে আসেন, দুর্গা ও কালী পূজায় অংশ নেন, গীতা পড়েন, হিন্দুস্থানি সংগীত, নৃত্যগীত ও অভিনয়ে অংশ নেন। রমজান মাসে একটানা কষ্টকর উপোস, নামাজ পড়া, বোরখা পড়া এগুলি ইসলামে বাধ্যতামূলক। হিন্দু ধর্মেও উপোস প্রার্থনা এসব আছে। কিন্তু হিন্দুত্বে করতেই হবে এমন নির্দেশ নেই। কেউ বছরে একবার কালী পূজা বা শিবরাত্রির উপবাস করল কেউ বা করলো না তাতে হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না। কোরান ও বাইবেল অনুযায়ী তাদের সম্প্রদায়ের সব কিছুই ভালো। কিন্তু হিন্দুদের পুরাণগুলিতে দেখা যায় সমস্ত দেব-দেবী সাধু এদের গুনাগুণের সঙ্গে ভুল ত্রুটি আছে অনেক কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্মের মতো এতটা গণতান্ত্রিকতা,

এতটা বৈচিত্র্য বিশ্বে আর নেই। তাই আজও নতুন করে নানা স্থানে শ্রদ্ধার সঙ্গে চর্চা চলেছে হিন্দু ধর্মের।

কোচবিহার শহরে পরিশ্রুত পানীয় জল কবে পাওয়া যাবে?

কোচবিহারের পৌরপিতাকে প্রথমেই বলতে চাই আমরা পৌর নাগরিকরা পরিশ্রুত পানীয় জল চাই। বিগত এক দশক ধরে শুনে আসছি তোর্ষা নদী থেকে জল উত্তোলন করে সেই জল পরিশ্রুত করে কোচবিহার শহরের প্রতিটি ঘরে ঘরে সরবরাহ করা হবে। আজও সেই জল প্রকল্প বিশবাঁও জলে। বাস্তবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে কিনা সে বিষয়ে কোচবিহারবাসী সন্দিহান। নাগরিকরা জানতে চায় আর কতকাল চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকবে পৌরসভার জল সরবরাহ ব্যবস্থার দিকে। মানুষকে খুব শীঘ্রই জলের জন্যে হাহাকার করতে হবে। পানীয় জল প্রকল্পের সংযোগ পেয়েও যখন জল মিলছে না তখন নাগরিকরা জানতে চায় ৩৬ কোটির জলপ্রকল্প বর্তমানে যার ব্যয় ৬০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে, সেই প্রকল্পের পরিণতি কী? সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে পৌরসভা জলের দায়িত্ব নিজেদের কাছে না রেখে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের নিকট অর্পণ করতে চান। তাই যদি হয় তবে সে কাজটি করতে এতো বিলম্ব কেন? ঐতিহ্যের শহর কোচবিহারের নাগরিকগণ এখনো অপরিশ্রুত জল খেতে বাধ্য হচ্ছে কেন? পৌরপিতা জবাব দিন। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। বিষয়টি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবেন না। সত্বর ব্যবস্থা নিন।

—**বিমল চন্দ্র পাল**,
সভাপতি, নাগরিক অধিকার বাঁচাও কমিটি,
শ্যামাপ্রসাদ পল্লী, কোচবিহার।

প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন

রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায্য বেতনের দাবিতে একের পর এক নতুন পদক্ষেপে সারা রাজ্যের রাজনীতি সরগরম হয়ে গেছে। মূলত শিক্ষক আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা আছে অরাজনৈতিক সংগঠন উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ বিক্ষোভ চলছিল। তাই যে কোনো মূল্যে পিআরটি স্কেল চালু করার জন্য এখন আন্দোলন আরও তীব্র আকার নেয়। রাজ্য সরকার যুবশ্রী শুভশ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্লাবকে অনুদানের মাধ্যমে অর্থ নয়ছয় করলেও শিক্ষকরা বঞ্চিত হয়ে আছেন। তাই শিক্ষকেরাও সরকারের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। লোকসভা ভোটে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফলে তা প্রমাণিত। তাছাড়া কলকাতার রাজপথে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন সে কথাই প্রমাণ করে। কিন্তু শিক্ষকরা সমাজের মেরুদণ্ড বলে পরিচিত। এই শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে রাজ্য প্রশাসন যেভাবে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত করেছে তা কলঙ্কিত ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ ঘটনা গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার শামিল। কিন্তু এ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকেরা বেতন বৈষম্যের শিকার তা সর্বৈব সত্য। এন সি টি ই নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতামান হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর এবং ২ বছরের ডি এল এড্ কোর্স করা প্রয়োজন। এর আগে ২০১২ সালে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের পক্ষে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, যে সকল শিক্ষকের এই যোগ্যতা নেই তাঁদের ২০১৫ সালের মধ্যে সেই যোগ্যতা পূরণ করতে হবে। কিন্তু সেইমতো শিক্ষকেরা যোগ্যতা বাড়ালেও রাজ্য সরকার কথা রাখেনি। যোগ্যতা অনুযায়ী অন্য রাজ্যের শিক্ষকেরা বেতন পেলেও এ রাজ্যের শিক্ষকেরা অবহেলিত থেকেই গেছেন। অর্থাৎ অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকেরা প্রায় ১০ হাজার টাকা কম বেতন পাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ্য যে মাদ্রাসার শিক্ষকেরাও উচ্চতর বেতনক্রম পেয়ে আসছে ২০০৬ সাল থেকে। এহেন অবস্থায় দীর্ঘদিন বঞ্চনার শিকার হয়ে প্রাথমিক শিক্ষকেরা তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায়ে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। 'এক দেশ এক বেতনক্রম' অন্য রাজ্যে চালু থাকলেও এ রাজ্যের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম হবে কেন? রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা মান বাড়াতে যেমন বাধ্য করেছে সেরকম বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা থাকার কথা নয়, একথা বলাই বাহুল্য।

—**সমীর কুমার দাস**,
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

চিন্তা করতেও শরীর শিউরে ওঠে

আমার একটা বদ অভ্যাস হলো কোনো কিছু অন্যায় মনে হলে তার প্রতিবাদ না করে চুপচাপ বসে থাকতে না পারা। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু তথ্য নিয়ে এই পত্রের অবতারণা। (১) গত ১৭ জুলাই রাতে বাড়ি ফেরার পথে প্রাক্তন মিস ইন্ডিয়া ঊষসী সেনগুপ্ত হেনস্থার শিকার হন। হেনস্থাকারীরা শেখ ওয়াসিম, আতিফ খান, শেখ রাহি, ফারদিন খান, আবির আলি, শেখ গনি ও ইমরান আলি। পুলিশ হালকা ধারার কেস দেওয়ায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ১ হাজার টাকার বিনিময়ে ব্যক্তিগত বন্ডে আসামিরা ছাড়া পেয়ে যায়। (২) ২৮ জুলাই স্কুটারে চেপে অফিস যাওয়ার পথে দিবালোকে সুমন কুমারী নাম্নী প্রাক্তন জাতীয় পর্যায়ের বক্সার শ্লীলতাহানি ও নিগ্রহের শিকার হন। আক্রমণকারীরা হলো শেখ ফিরোজ, ওয়াশিম খান ও রাহুল শর্মা। (৩) ২৮ জুলাই বিষ্ণুপুরে মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের কটূক্তি করার জন্য ৬ রোমিওকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদের নাম রাজা শেখ, আমন ঘরামি, হাসান আলি মোল্লা, সাজেদ ঘরামি, রসুল আখন ও সামাদ মোল্লা। এখানে একটা প্রশ্ন, যদি আক্রান্ত মহিলারা মুসলমান হতেন আর আক্রমণকারীরা হিন্দু হতে তবে এতদিনে প্রতিবাদের বন্যা বয়ে যেত। বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর আদ্যশ্রাদ্ধ আরম্ভ হতো। (৪) পুলওয়ামায় জঙ্গি আক্রমণে ৪০ জন সেনা নিহত হলো। যদি বাংলাদেশে অথবা পাকিস্তানে একজন হিন্দুর আক্রমণে একজন মুসলমান সেনা নিহত হতো তাহলে সে দেশের হিন্দুদের কী অবস্থা হতো তা চিন্তা করতেও গা শিউরে ওঠে।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত**, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪।



ভারতবর্ষে রামের মতো সত্য আর কেহ নহে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামায়ণ মহাভারতকে যখন জগতের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস। এখন বিদেশীর সাহিত্য ভাণ্ডারে যাচাই করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে এপিক। আমরা 'এপিক' শব্দের বাংলা নামকরণ করিয়াছি মহাকাব্য। এখন আমরা রামায়ণ মহাভারতকে মহাকাব্যই বলিয়া থাকি।

মহাকাব্য নামটি ভালোই হইয়াছে। নামের মধ্যেই যেন তাহার সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়। ইহাকে আমরা কোনো বিদেশী শব্দের অনুবাদ বলিয়া এখন যদি না স্বীকার করি তাহাতে ক্ষতি হয় না।

অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করিলে পরদেশীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের 'এপিক' শব্দের লক্ষণের সহিত আগাগোড়া না মিলিলেই মহাকাব্যনামধারীকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এরূপ জবাবদিহীর মধ্যে থাকা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

মহাকাব্য বলিতে কি বুঝি আমরা তাহার আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এপিকের সঙ্গে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়া দিব এমন পণ করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা করিব? প্যারাডাইস লস্টকেও তো সাধারণে এপিক বলে, তা যদি হয় তবে রামায়ণ মহাভারত এপিক নহে— উভয়ের এক পংক্তিতে স্থান হইতেই পারে না।

মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য যা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎসম্প্রদায়ের কথা।

একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্ম্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর এক শ্রেণীর কবি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া, একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে— আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন— ইঁহারা যাহা রচনা করেন, তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা— কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই— কিন্তু রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।

বস্তুতঃ ব্যাস বাল্মীকি তো কাহারো নাম ছিল না। ও তো একটা উদ্দেশ্য নামকরণ মাত্র। এত বড়ো বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ; আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ জোড়া দুইটি কাব্য তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে, কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে তেমনি ইলিয়ড্, এনিড্ ছিল। তাহারা সমস্ত গ্রীস ও রোমের হৃদ্‌পদ্ম-সম্ভব ও হৃদ্‌পদ্মবাসী ছিল। কবি হোমার ও ভার্জ্জিল আপন আপন

দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন। সেই কাব্য উৎসবের মতো স্ব স্ব দেশের নিগূঢ় অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে।

আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিল্টনের প্যারাডাইস্ লস্টের ভাষায় গাম্ভীর্য্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গম্ভীরতা যতই থাক্ না কেন, তথাপি দেশের ধন নহে,—তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।

অতএব এই গুটিকয়েক মাত্র প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় ফেলিয়া এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে? ইঁহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন— ইঁহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার এক ধারা য়ুরোপে এবং এক ধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে এবং ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে।

আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস ও রোম্ তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনার আর কিছুই বাকি রাখে নাই।

এই জন্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে— মুদীর দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছে।

এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে— রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্মের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।

এই কারণে, রামায়ণ মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড় সমালোচকই হই না কেন একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্ আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।

বীররস প্রধান কাব্যকেই এপিক্ বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, তাহার কারণ যে দেশে যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পাইয়াছে, সে দেশে সে কালে স্বভাবতই এপিক্ বীররস প্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও যুদ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথাপি রামায়ণে যে রস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বীররস নহে। তাহাতে বাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই— যুদ্ধঘটনাই তাহার মুখ্য বর্ণনার বিষয় নহে।

দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন পণ্ডিতেরা ইহাই প্রমাণ করিবেন। এই ভূমিকায় পাণ্ডিত্যের অবকাশ নাই; এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে কবি যদি রামায়ণে নর-চরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন, তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত— সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।

আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

''সমগ্রা রুপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং।''

কোন্ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র লক্ষ্মীরূপ গ্রহণ করিয়াছেন?

—তখন নারদ কহিলেন—

''দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগু নৈর্যুতং।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ।।''

এত গুণযুক্ত পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

মানুষের চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এবং সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের এই আদর্শ চরিত-বর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্ম্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশ জয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংঘাত এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই— যে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রয়ের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য সুবিধার জন্য ছিল না— গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রম-ধর্ম্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী-মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্ম্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন, এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। যথাযথের সীমা কোন্‌খানে এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্যকলা অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে এ কথার তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। বিদেশী যে সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতি প্রাকৃত হইয়াছে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতি প্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।

যেখানে যে আদর্শ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়া গেলে সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহ্যই হয় না। আমাদের শ্রুতিযন্ত্রে আমরা যতসংখ্যক শব্দতরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি করিতে পারি তাহার সীমা আছে, সেই সীমার উপরের সপ্তকে সুর চড়াইলে আমাদের কর্ণ তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে চরিত্র এবং ভাব উদ্ভাবন সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।এ যদি সত্য হয়, তবে একথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া গেছে যে রামায়ণ-কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। এই রামায়ণ-কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবণিতা আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে— আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য্য করিয়াছে তাহা নহে— ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে, ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা নহে— ইহা তাহাদের কাব্য।

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, রামায়ণ যে একই কালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব হইত না, যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত, যদি তাহা আমাদের সংসার-সীমার মধ্যেও ধরা না দিত।

এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমালোচক তাঁহাদের কাব্যবিচারের আদর্শ অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন, তবে তাঁহাদের দেশের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আরো পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায়, তাহা পাইয়াছে।

রামায়ণ এবং মহাভারতকেও আমি বিশেষতঃ এই ভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ্‌ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই রামায়ণ চরিত্র সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন, তখন, আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগ-মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা— এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও ভক্তি আছে, সেখানে পূজাকারকের ভক্তির হিল্লোল তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজার দর যাচাই করা— কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিস। পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া চতুর যাচনাদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎসুক। এরূপ যাচাই ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্য আছে, কিন্তু তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা— সমালোচক পূজারি পুরোহিত— তিনি নিজের অথবা সর্ব্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।

ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার ভার দিলেন। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি অধিক আড়ম্বর করিয়া তাঁহার পূজা আচ্ছন্ন করিতে কুণ্ঠিত। আমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি যে, বাল্মীকির রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোনো ঐতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্য্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। এ কথা বলে নাই যে বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে— এ কথা বলে নাই যে এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য। নহে— রাম, লক্ষ্মণ, সীতা তাহার যত সত্য। পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব-সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পূরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উন্মোচিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছে।

যে জাতি খণ্ড-সত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তব-সত্যের অনুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন— তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন— মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী। অন্যদিকে, যাঁহারা বলিয়াছেন ''ভূমৈব সুখং। ভুমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'' যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ঋণ কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে মানব-সভ্যতা আপন ধূলিধূম্রসমাকীর্ণ কারখানা ঘরের জনতামধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে। রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানাঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্ম্মলবায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।

(দীনেশচন্দ্র সেনের রামায়ণী কথার রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা)

রামভক্ত রবীন্দ্রনাথ

পরমেশ চৌধুরী

ভক্তিরস

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বরাবরই ভক্তিবাদী। তিনি ঈশ্বরকে দেবালয়ে মন্দিরে মসজিদে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেননি, করেছেন অন্তর নিভৃতে। যেহেতু কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভক্তিরস প্রধান সেহেতু কৃত্তিবাসের রামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : 'কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলে আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার পরম ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এই রামায়ণে ভক্তির মাধ্যমেই ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে সাধারণ মানুষ।' এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে উপরোক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবটি ধরা দিয়েছে। ভগবান যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালির অতি সামান্যে সেবাও যে তাঁহার কাছে অগ্রাহ্য হয় না, পাপিষ্ঠ রাক্ষসকেও যে তিনি যথোচিত শাস্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই ভাবটিই কৃত্তিবাসে প্রবল হইয়া ভারতবর্ষে রামায়ণ কথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায় আর একটা বিশেষ পথে লইয়া গেছে।'

কবির দুঃখ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং হরগৌরীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্যকবিতার চেয়ে অনেক বেশি মহৎ হলেও, রাধাকৃষ্ণ বা হর-গৌরী কথার মতো বাঙ্গালির ধর্মচেতনা ও বিশ্বাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। উত্তর ভারতের রামভক্তিবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হিন্দু সমাজ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। বাঙ্গালি হৃদয়ে যে সে তুলনায় রামায়ণ সাড়া জাগাতে পারেনি তার জন্য রবীন্দ্রনাথের দুঃখ : 'বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর। (লোকসাহিত্য, পৃ. ১২০)

নারায়ণের অবতার

হিন্দুরা বিশ্বাস করে রাম নারায়ণের অবতার। এই নারায়ণের প্রতিও ছিল রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা। হিন্দুদের দেবতা নারায়ণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ দুর্বলতা ছিল তা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ ধর্মতত্ত্বে বলে থাকে সব নরের মধ্যে নারায়ণের আবির্ভাব আছে। (ছন্দ, ছন্দের অর্থ ১৩২৪, চৈত্র)

বন্যদ্রব্যকে এরকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চুপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মৌমাছির বুদ্ধি করে তুললে, নারায়ণের দরবারে হিসাব-নিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে। (কালান্তর, চরকা ১৩৩২, ভাদ্র)

যে পক্ষ অক্ষৌহিণী সেনাকেই গণনাগৌ রবে বড়ো সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি, তবে নারায়ণ যতই একলা হোন এবং যতই রুদ্রমূর্তি ধরিয়া আসুন, তিনিই জিতাইয়া দিবেন।' ('রাজা', 'প্রজা' সমস্যা, ১৩১৫, আষাঢ়)।

আশার কথা এই যে, নারায়ণকেই যদি সারথি করি তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না, লড়াই এক দিনে শেষ হবে না, কিন্তু শেষ হবেই, জিৎ হবে তার সন্দেহ নেই। (শান্তিনিকেতন, দশের ইচ্ছা, ১৩১৫ চৈত্র ৩১)

দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতব্ মহাত্মন

মানুষ যখন প্রাণমন দিয়ে স্তব করতে পেরেছে :

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্তং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ

তুমিই অনন্তবীর্য, তুমিই অমিত বিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ কর, তুমিই সমস্ত। (জাভাযাত্রীর পত্র, তৃতীয় পত্র ১৩৩৪, শ্রাবণ ৩)

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার। (গীতাঞ্জলি ১০৮)

১৯২১, মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ শিকাগো থেকে দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। তাতেও প্রকাশ পেয়েছে 'নারায়ণের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস :

'Our fight is a spiritual fight– it is for man. We are to emancipate man from the meshes that he himself has woven round him– these organisations of national egoism...

We, the famined ragged ragamuffins of the East, are to win freedom for all humanity. We have no word for 'Nation' in our language. When we borrow this word from other people it never fits us. For we are to make our league with Narayan, and our triumph will not give us anything but victory itself : victory for god's world. Letters to a Friend, 1928, p. 128.

অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য মানুষের আত্মিক মুক্তি।

আমাদের অর্থাৎ প্রাচ্যদেশের দীনদরিদ্র লক্ষ্মীছাড়াদের ওপরই আজ দায়িত্ব বর্তেছে। 'নেশন' শব্দটা আমাদের ভাষায় নেই। এ-শব্দের কোনো ভারতীয় প্রতিশব্দই নেই। এ শব্দটি আমরা ধার করেছি অন্যদের কাছ থেকে। মূলত আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে নারায়ণের কাছে। সিদ্ধিলাভ আমরা করবই এবং অসামান্য হবে এই সিদ্ধিলাভ। জয় আমাদের হবেই এবং এই জয় বিধাতারই জয়।

(লেখকের দস্তী হিন্দু রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত)

কৃত্তিবাসী রামায়ণ : সনাতন বাঙ্গালি সংস্কৃতির প্রতীক

অভিমন্যু গুহ

অনেক বাঙ্গালি পণ্ডিত বলেছেন রাম নাকি বাঙ্গলার সংস্কৃতির অঙ্গ নন। বাঙ্গলার সংস্কৃতি বলতে তাঁরা কী বোঝেন সে কথায় পরে আসছি, কিন্তু বাঙ্গলার সংস্কৃতির সঙ্গে মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের যে ওতপ্রোত সম্পর্ক তা পুঁথিগত প্রমাণ ছাড়াও অন্যভাবে বোঝা যায়। শহরে বসে হয়তো ততটা বোঝা যাবে না, কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে দৈনন্দিন জীবনে রামায়ণ পাঠের যে চল রয়েছে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যাতে নিয়ম করে অংশগ্রহণ করে। শহরে যে যৌথ পরিবারগুলি এখনও টিকে রয়েছে, সেখানেও বিস্মৃত-যুগের মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা ঠাকুমা-দিদিমার কাছে রামায়ণের গুরুত্ব রয়েছে। মুজতবা আলি কবেই বলে গেছেন, 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।' রামায়ণ-পাঠের এই প্রবহমানতা তো আজকের নয়, আজ থেকে পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় আগে মূল সংস্কৃত থেকে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ পাঠ বাঙ্গালি বাড়ির পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবার পক্ষেই কিছুটা দুরূহ ছিল। তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকতো কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

যে রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার জন্মসাল নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে, তবে তিনি যে পঞ্চদশ শতকের ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। কবির আত্মবিবরণ থেকে জানা গিয়েছে তাঁর বাবার নাম বনমালী, ঠাকুরদার নাম মুরারী, মায়ের নাম মেনকা। তাঁরা ছয়-সাত ভাই, এক বোন। বারো বছর বয়সে তিনি উত্তরবঙ্গে শিক্ষা নিতে যান, শিক্ষান্তে চলে যান গৌড় রাজসভায় রাজা দনুজমর্দন কংস বা গণেশের (মতান্তরে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের) কাছে। কৃত্তিবাসের কাব্য প্রতিভায় গৌড়েশ্বর আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে রামায়ণ রচনার আদেশ দেন। এরই কারণে কৃত্তিবাস ওঝা 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন।

তিনি পাঁচটি পর্যায় বা 'কাণ্ডে' এই পাঁচালী রচনা করেন। এর মধ্যে একমাত্র উত্তরকাণ্ড বাদে আর কোনোটিরই প্রাচীন পুঁথি পাওয়া



যায়নি। কিন্তু বাঙ্গলার মধ্যযুগে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় পাঁচালীকারদের পক্ষে মূল রামায়ণের প্রতিরূপটি সবসময় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সংস্করণ শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ছাপিয়ে ছিল ১৮০২-০৩ সালে, কারণ তারাও দেখেছিল নেটিভদের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে হবে। তবে এখানে কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী'র মূল পুঁথি না পাওয়া যাওয়ায় প্রচলিত পাঁচালীকারদের ভাষ্যকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮৩০-৩৪ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় দু'খণ্ডে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে রচনাটির আদি রূপ ফিরিয়ে দেওয়ার কিছুটা চেষ্টা হয়। পরবর্তীকালে নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই কাজই আরও বিশদে করেন।

বাল্মীকি রামায়ণকে অনেকাংশে ভেঙে গড়ে বাঙ্গালিদের উপযোগী করার চেষ্টা করেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। বাঙ্গালি জাতিকে রামনামে মাতোয়ারা করাতে তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশি। ভাষাবিদ সুকুমার সেনের বক্তব্য : 'কৃত্তিবাসের কাব্য সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি ইহা সমগ্র বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধ-বণিতাকে তাহাদের দুঃখে-সুখে, উত্থানে পতনে ভোগে ত্যাগে, কর্মে অবসরে— সর্ববিধ অবস্থায় সমান আনন্দ জোগাইয়া আসিতেছে। কাব্যের উৎসর্ষ এবং কবির সৌভাগ্য ইহা হইতে আর অধিক কী হইতে পারে?'

বাঙ্গলার গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধেও তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রসঙ্গ বার বার এসেছে। নদীয়া জেলার ফুলিয়ায় যেখানে কৃত্তিবাস জন্মেছিলেন সেই স্থান আজ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আসলে কৃত্তিবাস তাঁর 'শ্রীরাম পাঁচালী'তে চলমান ভারতীয় জীবন-দর্শনকেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'রাম' ভালো, 'জয় শ্রীরাম' খারাপ গোছের থিওরি যারা বাজারে আমদানি করতে চাইছেন, তাদের জেনে রাখা ভালো মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে 'শ্রীরাম' নামে অভিহিত করার কাজটিও কৃত্তিবাস ওঝারই করা। শুধু কৃত্তিবাসই বা কেন তারও আগে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পালবংশের রাজা রামপালদেবের পুত্র মদনপালদেবর মন্ত্রী সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত রচনা করেছিলেন, এই বাঙ্গলারই বুকে বসে। এ আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগের ঘটনা।

সুতরাং বাঙ্গলার সংস্কৃতিতে রামের অস্তিত্ব নেই বলে যাঁরা দাবি করেন তাদের অশিক্ষিত কিংবা মূর্খ বললে, 'অশিক্ষিত'দেরই অপমান করা হয়। এরা আসলে ধূর্ত ও শয়তান। মার্কস-লেনিনের আদর্শে ভারতবর্ষের সর্বনাশ ও ক্ষতিসাধন যাদের একমাত্র লক্ষ্য তারা আজ বাঙ্গালি সংস্কৃতির ধুয়ো তুলবে নিজেদের স্বার্থেই, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার অর্ধশতাব্দী পালন যাদের গোপন অভিলাষ, বাঙ্গলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা, সাতের দশকের নকশাল আন্দোলন থেকে আজও তারা প্রেরণা নিয়ে বাঙ্গালির তথাকথিত 'সংস্কৃতি'র নিজস্ব প্রোপাগাণ্ডা গড়ে তুলবে। সময় এসেছে ছয়ের-সাতের দশকের সেই ধ্বংসাত্মক নকশালি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্ট সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে বাঙ্গলার সনাতনী পরম্পরাকে তুলে ধরার। কৃত্তিবাস ওঝা তারই প্রতিরূপ।

বঙ্গদেশের লৌকিক জীবনে রাম ও রামায়ণ

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে রামায়ণের অবদান অপরিসীম। রামায়ণ একই সঙ্গে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রামকথার মৌখিক ঐতিহ্য পরিব্যাপ্ত ছিল ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড থেকে পার্শ্ববর্তী নেপাল, মায়ানমার এবং বাংলাদেশে। আর আঞ্চলিক স্তরে রামায়ণের কাহিনি বিধৃত রয়েছে তামিল ভাষায় কম্বনের রামায়ণে, তেলুগু রঙ্গনাথ রামায়ণে। ওড়িয়ায় পাচ্ছি সরলা দাসের 'বিলঙ্ক রামায়ণ', আর বলরাম দাসের 'জগমোহন রামায়ণ'। এর আগে চতুর্দশ শতকে অসমীয় ভাষায় 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' পঞ্চদশ শতকে, সরলা দাসের রচনাও তাই। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে পূর্বভারতে রামায়ণের চর্চা এবং প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও রামকথার মৌখিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতভূমিতে প্রবাহিত। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এইচ ডি সাংকালিয়া অভিমত প্রকাশ করেছেন, রামের কাহিনি খ্রিস্টপূর্বাব্দ ২৮৫০ থেকে ১৯৫০ এই প্রায় হাজার বছরের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। যদিও অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকার এই কাহিনির সূচনা হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ এমনটি বলেছেন। তাহলে বলা যায়, বৃহত্তর ভারত ভূখণ্ডে বহমান একটি রামকথার ধারা আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরবর্তী সময়ে বিকশিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। শুধু কৃত্তিবাসী নয়, বঙ্গে রামকাহিনি বারংবার পুনর্কথিত হয়েছে। রাম যে বাঙ্গালির জনজীবনে পরতে পরতে মিশে গিয়েছেন তা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় বঙ্গের লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। একই সঙ্গে বলার হনুমানের প্রতি ভক্তি সন্দর্শনে বঙ্গদেশের ইতিহাস নিতান্ত অর্বাচীন নয়। বাংলাদেশের রাজশাহীর নরেন্দ্র মিউজিয়ামে রাখা সম্ভবত ১১-১২ শতকের বেলে পাথরের হনুমান মূর্তি বঙ্গদেশের বজরংবলীর উপস্থিতির পাথুরে প্রমাণ হাজির করে। দাস্য ভক্তিভাবের চরম নিদর্শন হনুমানকে বাঙ্গালির কবি তাঁর সুললিত কাব্যে ধরেছেন এই ভাবে :

এতেক শুনিয়া তবে পবনকুমার।
কলেবর নখে চিরি করিল বিদার।।
সভামধ্যে দেখাইল বিদারিয়া বক্ষ।
অস্থিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ।।

গোপাল হালদার লিখেছেন, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' অন্তত চারশো বছর ধরে বাঙ্গালির আপন হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, বাল্মীকিকে মেনেও, কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালির নিজের ঘরোয়া আদর্শকে ধরে রেখেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম বীর হলেও বাঙ্গালি বীর, স্নেহ মমতায় গড়া এক কোমল প্রকৃতির মানুষ— এই হলো শ্রীযুক্ত হালদারের বক্তব্য। ডব্লু এল স্মিথ তাঁর Ramayana Tradition in Eastern India গ্রন্থে লিখছেন : The original Rāmāyana had been diffused in eastern India where at a very early date it had evolved into a distinct Eastern or Gaudian recension.

বাঙ্গালির সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপূজাই তো ধরে রেখেছে রামচন্দ্রের অকাল বোধনের ঐতিহ্য। রামকে বাঙ্গালির স্বীকৃতির এর চেয়ে বড়ো উদাহরণ আর কী হতে পারে!

স্পষ্টই বলা হয়েছে, পূর্ব ভারতে রামায়ণের গৌড়ীয় ধারা রয়েছে। বস্তুত, রামায়ণ কাহিনির এই লোক প্রচলিত ধারা বাঙ্গালি সংস্কৃতির মৌলিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়েছিল। এটি যেমন লোকসাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি লোকশিল্প মাধ্যমেও রামায়ণ পল্লীতে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ে। পটুয়ারা রামায়ণের কাহিনিকে উপজীব্য করে পট আঁকতেন এবং জড়ানো পটের সেই কাহিনিকে গান সহযোগে গ্রামঞ্চলে পরিবেশন করতেন। পটুয়ারা মিশ্র ধর্মীয় সংস্কৃতির বাহক ছিলেন। হিন্দু নামকরণ, আচার এবং বিষয়বস্তু অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান রীতি-ধর্ম পালন করতে দেখা যায় এই পটুয়াদের। এটি বঙ্গদেশের একান্ত নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঘরানা। বীরভূমের পটুয়ারা সমগ্র রামায়ণের কাহিনিকে মূল চারটি খণ্ডে পরিবেশন করতেন তাদের পটচিত্রের মধ্যে দিয়ে। প্রথম খণ্ডটি দশরথের দ্বারা অন্ধমুনির পুত্রকে হত্যা করা দিয়ে শুরু হয়। দ্বিতীয় খণ্ড রামের জন্ম থেকে বিবাহ অবধি কাহিনি বিবৃত করত। তৃতীয় খণ্ডে ছিল রাবণের মৃত্যু অবধি ঘটনাবলী। আর চতুর্থ খণ্ডে থাকত সীতার বনবাস। এই জেলায় লক্ষ্মণকে নিয়ে আলাদা পট আঁকা হতো— এখানে লক্ষ্মণ অবতার। সুতরাং বলা যায় বঙ্গদেশের লৌকিক সংস্কৃতি রামকাহিনিকে নিজের মতো করে ধারণ করেছে, ব্যাখ্যা করেছে এবং প্রকাশ করেছে সাধারণীকরণের মধ্য দিয়ে।

বঙ্গপ্রদেশের গায়েনরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রামায়ণ গান করতেন। বয়স্ক মানুষদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে রামায়ণের নির্বাচিত পংক্তি গায়েনরা পরিবেশন করতেন— যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রামের বনবাস, দশরথের মৃত্যু



এবং তৎপরবর্তী কৌশল্যা ও সুমিত্রার বিলাপ। আসলে বাঙ্গালি জীবনের এই সমস্ত অবশ্যম্ভাবী সংঘটনের সঙ্গে বাঙ্গালি কবি তার রামায়ণ কাহিনিকে এভাবেই সংযোজিত করেছেন— যা একান্তভাবে বাঙ্গালির আবেগকে তুলে ধরেছে। পূর্ববঙ্গের চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, যা বঙ্গদেশের আরেক অতুলনীয় সম্পদ, এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মহিলারা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গাইতেন। রামায়ণে গানের এই ধারা এখনও বঙ্গে এবং বৃহত্তর বঙ্গে বিলুপ্ত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের জামতাড়াতেও রামায়ণ গায়করা রয়েছেন, যারা অখণ্ড বঙ্গ ও বাঙ্গালির সামনে রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

একথা ঠিকই কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। এগুলির মধ্যে ভিন্নতা নেই এমন নয়। কিন্তু এই বিভিন্নতা রামায়ণ চর্চার ব্যাপকতার পরিচয় বহন করে একথা অনস্বীকার্য। এই রকম প্রায় দেড় হাজার পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করেছেন ডব্লু এল স্মিথ। ফলে বাঙ্গালির জীবনে রামের প্রভাব অন্তঃসলিলা ছিল দীর্ঘকাল ধরেই। যে কারণে পট ও গীতিকা ছাড়াও ছড়া-প্রবাদেও রামের এবং রামায়ণের অনুষঙ্গ বারংবার এসেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(১) রাম না হতে রামায়ণ।

(২) সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

(৩) যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ।

(৪) রামের বাণে মরি ভালো, বাঁদরের দাঁত খিঁচুনি সহ্য হয় না।

(৫) লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো। আবার,

বড়ো বড়ো বানরের বড়ো বড়ো পেট।
লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট।।

কথন প্রবচনে রামায়ণের অনুষঙ্গ বারংবার আসছে। যেমন--- 'ঘরের শত্রু বিভীষণ', 'কালনেমির লঙ্কা ভাগ', 'দেবর লক্ষ্মণ', 'লঙ্কা বহুদূর', 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' ইত্যাদি। এমনকী 'বানরের গলায় মুক্তার মালা'-র পেছনে কৃত্তিবাসী ললিত ছন্দের প্রেক্ষাপটটি অন্তর্লীন থেকেছে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিই :

লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু করি নিবেদন।
মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ।।
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশ্যালে।
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে।।

ধর্ম, বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে রামায়ণ এবং রাম কথার প্রভাব যে অনপনেয় তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একান্ত ভয়ের মুহূর্তেও তাই বাঙ্গালি রামকে স্মরণ করেছে বিপত্তারণ রূপে। আমরা ছোটোবেলার এই ছড়াটির কথা কি ভুলে গেলাম?

ভূত আমার পূত, পেত্নী আমার ঝি।
রাম-লক্ষ্মণ সঙ্গে আছে, ভয়টা আমার কী।।

বঙ্গদেশের বনবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও রামের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অযোধ্যা পাহাড়ে রামচন্দ্র-সীতা-লক্ষ্মণ এসেছিলেন এমন কাহিনি স্থানীয় সাঁওতাল সমাজ তাদের মৌখিক ঐতিহ্যে ধরে রেখেছে। অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় সুতানটান্ডির কাছে যে সীতাকুণ্ড, সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন রামের তিরের আঘাতে এই অনিঃশেষ জলধারার সৃষ্টি। পাহাড়ের জঙ্গলে সুতোর ন্যায় গাছের বাকলে লেগে থাকা উদ্ভিদাংশকে সীতার চুল বলে গণ্য করেন এই বনবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। এ ধরনের আরও বহু কাহিনি প্রচলিত রয়েছে বনবাসী সমাজের মধ্যে। তাই এমন এক ভূখণ্ডে রামের নামে জয়ধ্বনি উঠবে একথা বলাই বাহুল্য। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে এই জয়ধ্বনি শুনিয়েছেন বাঙ্গালিকে।

বশিষ্ঠ নারদমুনি করে বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে শব্দ 'রামজয়' শুনি।।

এই ধ্বনি বাঙ্গালি শুনেছে, বুকে ধারণ করেছে সহস্র বছর ধরে। হাজার বছর আগেই বঙ্গদেশে রামের উপরস্থিতির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বাঙ্গালির সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপুজাই তো ধরে রেখেছে রামচন্দ্রের অকাল বোধনের ঐতিহ্য। রামকে বাঙ্গালির স্বীকৃতির এর চেয়ে বড়ো উদাহরণ আর কী হতে পারে! রাম ও রামায়ণ বাঙ্গালির রক্তে হিমোগ্লোবিনের মতো মিশে রয়েছে, বিচ্ছিন্ন করতে গেলে তার প্রাণপাখিটিই উড়ে যাবে।

শ্রীরামচন্দ্র ও বঙ্গ-সংস্কৃতি

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

কথাটা দারুণ বিতর্ক তৈরি করেছে। 'জয় শ্রীরামে'র সঙ্গে বাঙ্গালির সম্পর্ক দেখতে পাননি নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত 'ভারতবত্ন' বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। 'জয় শ্রীরাম' নাকি আক্রমণাত্মক— অন্যকে অত্যাচার করার জন্য তৈরি করা শব্দ। কথাটি কত দূর গ্রহণযোগ্য বলা কঠিন। করণ বঙ্গদেশের সঙ্গে রামচন্দ্রের সম্পর্ক কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন। অধ্যাপক সেন কথাগুলি বলার পর প্রবল উৎসাহে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রে অর্ধশিক্ষিত নেতা-নেত্রী থেকে সংবাদপত্রের মসীজীবী উচ্চশিক্ষিতরা ক্রোক্কারধ্বনি শুরু করেছেন। তারা তকিয়ে দেখার দরকার বোধ করছেন না এই 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিটি সত্যিই অন্যকে অপর (outsider) করার ষড়যন্ত্র কিনা।

ড. অমর্ত্য সেন নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর নামই তো কবিগুরু-প্রদত্ত! যখন তিনি লেখেন 'রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশু সম্পদের স্থলে,কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন', তখন রামায়ণের যে ব্যাখ্যা, যে 'রণজয়ী' রামচন্দ্রকে দেখানো হলো, তিনি কি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের তীব্র প্রতিবাদের লক্ষ্যই থেকে যাবেন? 'উদ্বোধন' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের একটি প্রবন্ধ 'রাম ও তাঁহার চরিত্র' দেখলে সারা দেশে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকথা কেমন করে ছড়িয়ে পড়েছে তা তিনি দেখতে পেতেন। বলে রাখি লেখাটি তাঁর মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বিরচিত। এই ভারত কেন সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়া রাম কাহিনির প্রতিপত্তি সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেনের পূর্ণ ধরণা ছিল। তাঁর ভাষা : 'ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রামায়ণের বহুবিধ রূপ পাওয়া যায়। যবদ্বীপের মন্দিরে ও লোকমধ্যে যে রামায়ণ কথা আছে তাহা ৫টি কাব্যের সঙ্গে মেলে।' বঙ্গদেশ ভারতের পূর্ব সীমায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রামের জয়ধ্বনি এদেশকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে— তাম্রলিপ্ত বন্দর বাদ দিয়ে নিশ্চয় পৌঁছয়নি! যুক্তিবাদী মহাপণ্ডিত অধ্যাপক সেন কী বলেন?

বঙ্গদেশে রামচন্দ্র দশ অবতারের অন্যতম। একাদশ শতকে বাদাল, ধামোর হাট, নওগাঁও-রাজশাহীতে দশাবতারে রামচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই আছেন। দশম শতাব্দীতে ধরমপুর দক্ষিণ দিনাজপুরে মিলেছে আরেকটি দশাবতার মূর্তি। দ্বাদশ শতাব্দীতে পরিসন, ভানোর রাজশাহীর দশাবতার মূর্তিও উল্লেখযোগ্য। একাদশ শতাব্দীতে সোনারং, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকায় মিলেছে রামচন্দ্রের ধনুর্ধর অপূর্ব মূর্তি। বলে রাখি এই মূর্তিটি পাওয়া গেছে অধ্যাপক সেনের পূর্বপুরুষদের গ্রামের কাছাকাছি। গণেশপুর, মণ্ডা, নওগাঁ-রাজশাহীতে প্রাপ্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-মূর্তি অপূর্ব। মানুষ স্বভাবতই বিস্মরণশীল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন 'বাঙ্গালি ইতিহাস বিস্মৃত জাতি'। রামের নামে জয়ধ্বনি বঙ্গদেশে বহিরাগত হলে এসব মূর্তি এল কী করে? গড়লেন কারা?

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে ভট্টি কাব্য জনপ্রিয় হয়। কাব্যটির নাম 'রাবণবধ', তবে তা ভট্টি কাব্য নামেই বেশি পরিচিত ছিল। কবির পরিচয় ভালো মতো জানা যায় না। এই কাব্য বঙ্গদেশে ব্যাপক ভাবে পরিচিত ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে ভাসের 'প্রতিমা নাটক' ও 'অভিষেক নাটক' রামচরিত্র কেন্দ্রিক। সপ্তম শতাব্দীতে ভবভূতি লেখেন 'মহাবীর চরিত' আর 'উত্তর রামচরিত'। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গভাষীরা এই দ্বিতীয় নাটকটির প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর রামচরিতের অংশ বিশেষ সহজ স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ 'সীতার বনবাস' নামে প্রকাশ করেন। ১৮৬২-র সেই গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু রচনা ছাপা হয়। ১৮৬৫-তে উমেশচন্দ্র মিত্র এর নাট্যরূপ দেন। ১৮৬৬-তে কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন, 'সীতার বনবাস'-নাটক। ১৮৬৮-তে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একই গ্রন্থনির্ভর একটি গদ্য আখ্যান লেখেন। ১৮৮৮-তে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেখেন 'সীতার বনবাস'। সেটি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

নবম শতাব্দীতে অভিনন্দ রচনা করেন 'রামচরিত'। এখানে রাবাণ বধের কামনায় দুর্গার অকাল বোধনের কথা লেখা হয়েছে। তবে পূজা দিয়েছেন সঙ্কটমোচন রামচন্দ্র। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে রচিত প্রাচীনতম রামায়ণ-নির্ভর নাটক। ১০ম-১১শ শতাব্দীতে সন্ধ্যাকর নন্দী লিখেছিলেন 'রামচরিত'। এই রচনা রূপকধর্মী। কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর পোষক পাল রাজা রাম পালকে নায়ক করে এই কাব্য লেখেন। বিদ্রোহের সময় সাময়িক ভাবে রামপাল রাজলক্ষ্মীকে হারিয়ে ফেলেন। ঘটনাটি সীতা হরণ ও রাবণ বধের কাহিনিতে রূপান্তরিত করে আশ্চর্য দক্ষতায় লেখেন সন্ধ্যাকর নন্দী। রামকথা বঙ্গদেশে জনপ্রিয় না থাকলে ওই লেখা সম্ভব হতো না।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের জনপ্রিয় বঙ্গানুবাদ 'শ্রীরাম পাঁচালি' রচনা করেন। তাঁর রচনায় বহু জানা না জানা কবি ও গায়েনদের রচনা ঢুকে পড়েছিল। সামান্য কয়েকজনের নাম লিখছি। কৃষ্ণদাস রচিত 'রামনাম উপাসনা'র পুঁথি লেখা হয় ১৭১৭ শকাব্দে (১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে); পঞ্চানন চক্রবর্তী লেখেন 'রামরসায়ন', নটবর দত্ত লেখেন 'রামজন্ম পালা', অদ্ভুতাচার্যের 'অযোধ্যা-অরণ্য-আদি-উত্তরাকাণ্ডে'র বহু পুঁথি পাওয়া গেছে, অখণ্ডদাস বা অনন্তপণ্ডিত, অনন্তরাম দ্বিজের বহু রামায়ণ পালা পাওয়া গেছে। উৎসবানন্দ লিখেছিলেন, 'লবকুশ যুদ্ধ' , 'সীতার বনবাস', কংসারি পণ্ডিত, কণ্ঠমণি দাস,



কণ্ঠহার দ্বিজ ছিলেন বিখ্যাত রামায়ণ গায়ক। কবিচন্দ্র দ্বিজ ছিলেন বিষ্ণুপুর রাজসভার কবি। তিনি 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' লিখেছেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। কমললোচন দত্ত, কল্যাণ দে, কালিদাস, কালীকিঙ্কর দেবদাস, কালীচরণ ভট্ট, কুমুদ দত্ত, কেশব মিত্র, কৈলাস বসু, খোসাল শর্মা, গঙ্গাদাস সেন, গৌরীকান্ত, ঘনশ্যাম, চন্দ্রকিশোর দাস, জগৎবল্লভ, জগন্নাথ দাস, জয়চন্দ্র নরপতি, জীবন চক্রবর্তী, তিলকচন্দ্র আচার্য, দয়ারাম, দুর্গাচরণ দ্বিজ, দুর্লভ দ্বিজ, দুলাল দ্বিজ, দেবানন্দ দ্বিজ, দেবীদাস, দেবীনন্দন, ধনঞ্জয় দ্বিজ, ধর্মদাস, নারায়ণ দাস, নিধিরাম দ্বিজ, পঞ্চানন দ্বিজ, প্রসাদ দাস, ফকিররাম কবিভূষণ, বংশীমোহন, ব্রহ্মসুন্দর দ্বিজ, ভবানন্দ, ভবানী দাস, রামপ্রসাদ, রামমোহন, রামশঙ্কর, রামানন্দ ঘোষ, রামানন্দ যতি, রুদ্রসেন শর্মা, লক্ষ্মণ দ্বিজ, লক্ষ্মীরাম, লোকনাথ সেন, শঙ্কর, শম্ভু সুত, শিবরাম, শ্যামাচরণ খাস্তগির, শ্রীধর বানিয়া, ষষ্ঠীচরণ মজুমদার, ষষ্ঠীধর সেনগুপ্ত, সঞ্জয়, সত্যানন্দ, সম্পদ রায়, সাফল্য দ্বিজ, হটুশর্মা, হরেন্দ্র নারায়ণ মহারাজা। সবার কথা লিখলে মহাকাব্য হয়ে যাবে। এর পরও বলা হবে রামচন্দ্র বঙ্গদেশে বহিরাগত!

তিনজনের কথা লিখে প্রসঙ্গ বদলাব। জগদ্রাম রায় বঙ্গদেশে বিশেষ ধরনের রামভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি দামোদরের দক্ষিণে মেজিয়ার নিকটবর্তী আধগাঁ-ভুলুই গ্রামে বাস করতেন। তিনি ও তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ রচনা করেন 'রামায়ণ' আর 'দুর্গা পঞ্চরাত্রি' (সর্বপ্রাচীন পুঁথি ১৭৭১ খ্রি:)। রামচন্দ্রের অকাল বোধনের তাত্ত্বিক কাঠামো এই শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট। প্রকৃত সত্য হলো কৃত্তিবাসী রামায়ণে অকালবোধন প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। রাম ভক্তিবাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরে এই বিষয়টি রামায়ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকবে। জগদ্রাম রায় প্রতিষ্ঠিত দুর্গোৎসব রায় বঙ্গের একটি ব্যতিক্রমী উৎসব।

'চন্দ্রাবতী'র রামায়ণ পাওয়া গেছে পূর্ববঙ্গে। পিতা দ্বিজ বংশী দাস। চন্দ্রাবতী মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি। তাঁর রচনা ছোটো। আর এই রামায়ণটি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের পূর্বপুরুষের বাড়ির কাছে মোটামুটি জনপ্রিয় ছিল।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, রাজশাহীতে সংগৃহীত আছে ছাদেক আলীর রামায়ণ। 'রামচন্দ্রের বনবাস' লিখেছিলেন তিনি। এটি



হাওড়ার রামরাজাতলায় প্রাচীন রামঠাকুর।

সংগ্রহ করেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। পুঁথিটি অসম্পূর্ণ। ভণিতায় আছে 'শ্রীরামের বনবাস...ছাদেক আলি কহে।' কেন ছাদেক আলি রামায়ণ কথা লিখলেন? আসলে বঙ্গদেশে মুসলমানরা প্রথমদিকে ওয়াহাবি বা ফরাজি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিল না। তারা দেশীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করেনি।

কালের বিচারে পূর্ব ভারতে রামায়ণের প্রভাব পড়েছে তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' রচনার বহুপূর্বে। কৃত্তিবাসের 'রাম পাঁচালী' রচিত হয় দেড়শো বছর আগে। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত তাঁর কাব্য। একই কথা অসম ও ওড়িশায়। অসমীয় ভাষায় চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা হয় দুর্গাবরের 'গীতরামায়ণ'। মহামাণিক্য মাধব কন্দলীর রামায়ণ--- এটিও সমসাময়িক। মহাপুরুষিয়া মতের শঙ্করদেব গদ্যে রামায়ণ অনুবাদ করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। তিনি 'রামবিজয় নাটক'ও রচনা করেন। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধব দেব, তিনি রামায়ণের আদিকাণ্ড অনুবাদ করেছিলেন। ওড়িয়া ভাষায় বলরাম দাসের রামায়ণ 'জগমোহন রামায়ণ' বা 'দণ্ডী রামায়ণ' নামে পরিচিত। বিশিষ্ট ওড়িয়া সাহিত্যিক ফকিরমোহন সেনাপতি গত শতাব্দে পদ্যচ্ছন্দে সম্পূর্ণ রামায়ণ রচনা করেছেন। এর পরও পণ্ডিত আর মূর্খ এক কাতারে দাঁড়িয়ে রাজনীতির কারণে রামনামের বিরোধিতা করবেন?

বঙ্গদেশের রামভক্তিবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যের পরিব্রাজক জীবন কথায়। তাঁর সহপাঠী মুরারি গুপ্ত ছিলেন রামভক্ত। নিজেকে ভাবতেন হনুমান। তিনি গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণাবতার ভেবে আত্মদ্বন্দ্বে আত্মহত্যায় উদ্যত হন। গৃহদেবতা রামকে অসম্মানও করতে পারেন না, অথচ প্রত্যক্ষ 'অভিনব হেম কল্পতরু' অবতীর্ণ কৃষ্ণকেও অসম্মান করবেন কি করে! শ্রী গৌরাঙ্গ তাঁকে গঙ্গাকূলে রামরূপে দেখা দিলেন। বললেন, ত্রেতায় তিনিই দশানন রাবণকে পরাস্ত করেছিলেন!

মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক।।
দূর্বাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্ধর।।
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্র গণে।।

এসব রচনা বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রচলিত। নাগরিক মতিছন্ন বিদেশি ভাবাদর্শের তারা ধার ধারেন না। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস যাত্রার সময় রামনাম নিয়েই পর্যটন শুরু করেছিলেন— সেকথা কি এইসব প্রগল্‌ভ সবজান্তারা জানেন? তিনি বলে চলেন :



রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্।।

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক করা অন্যায়, শ্রীরামকে বঙ্গদেশে বহিরাগত বলা চরম অপরাধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহদেবতা রঘুবীর, একথা ভুলে যেতে হবে? তাঁর স্বহস্ত লিখিত রামায়ণ কথার পুঁথি—'যোগাদ্যার পালা' 'সুবাহুর পালা'র কথা ভুলে যেতে হবে? ভুলে যাব সদ্য-উপবীত সংস্কার হওয়া গদাধর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'মহীরাবণ পালা'? 'সুবাহুর পালা'র শেষে আছে :

শ্রী গদাধরকে বর দিবে ওহে গুণনিধি।
কল্যাণে রাখিবে রাম তোমায় নিবেদি।।

এসব কথা না জানা অজ্ঞতা। আর তাকেই উপদেশের বিষয় করা অজ্ঞানের আস্ফালন ছাড়া কী বলব?

বঙ্গদেশের নানা প্রান্তে ৩৫টি তারিখযুক্ত রামমন্দির থাকা সত্ত্বেও রামকে বরিরাগত বলার পিছনে যুক্তি ও বিবেচনার সীমা পরিসীমা নেই।

বাঙ্গালির নামে রাম-সীতার অভাব নেই। জনমদুখিনী সীতার নাম দেবার প্রবণতা একটু কম, তা থেকেও বোঝা যায় রামায়ণ আমাদের কতখানি প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-সংস্কৃতির দ্বারা নিষ্ণাত ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল 'রামায়ণ' ঘরের কথাকে বড়ো করে তুলে ধরেছে। কৃত্তিবাসের রাম 'ভক্তবৎসল রাম'। শুধু কি তাই, বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনা রাম-নির্ভর। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে রামায়ণ কথা প্রত্যক্ষ। 'রক্তকরবী'র কাহিনি ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যক্ষপুরীর রাজা 'এক দেহে রাবণ ও বিভীষণ'।

শেষ করব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদরের কৃষ্ণপুর গ্রামবাসী ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর ভণিতায় পাওয়া একটি পুঁথির কথা বলে। এক দুপুরে কবি বসে আছেন। এক অসাধারণ সুদর্শন যুবক এলেন। জানতে চাইলেন জগন্নাথের পুরী কোন দিকে? ঘনরাম দেখিয়ে দিলেন। তারপর এক অপূর্ব সুন্দরী গৃববধূ এলেন। তিনিও একই প্রশ্ন করলেন। ঘনরাম পুরুষোত্তম তীর্থের পথ দেখিয়ে অপার্থিব এই দিব্য সৌন্দর্যে ঘনরামের মন পবিত্রভাবে বিহ্বল হলো। আবার এক স্বর্ণাভ রূপবান যুবক এলেন— একই প্রশ্ন করলেন। যন্ত্রবৎ ঘনরাম দেখালেন জগন্নাথের পথ। এবার এক হনুমান এলে— ঘনরাম তাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, আপনি নিশ্চয় বজ্রাঙ্গবলী রামভক্ত হনুমান। স্মিত হাসলেন হনুমান— কেন? সামনে যাঁরা গেলেন তাঁরা নিশ্চয় শ্রীরাম— সীতা আর শ্রী লক্ষ্মণ! হায় হায় করতে থাকলেন তিনি। হনুমান তাঁকে মৃদু তিরস্কার করে চলে গেলেন। আজকের পশ্চিমবঙ্গে রামচন্দ্র সম্পর্কে যাঁরা অজ্ঞতা প্রকাশ করছেন তাঁদের জন্য এই রূপক-কাহিনিটি হয়তো কোনো অন্য অর্থ ও তাৎপর্য বহন করবে। ■

স্থান	দেবমন্দির	সময়কাল
ঘুরিসা, বীরভূম	রঘুনাথ	১৬৩৩
রামপুর, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া	রঘুনাথ	১৬৪০
বাঁকুড়া	রঘুনাথ	১৬৪০
দিগনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া	রাঘবেশ্বর	১৬৬৯
সবরাকন, তালডাংরা, বাঁকুড়া	রামকৃষ্ণ	১৬৭৭
নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোহর	রামেশ্বরী	১৬৯৮
রাউতাড়া, আমতা, হাওড়া	সীতারাম	১৭০০
হরিপাল, হুগলী	সীতারাম	১৭৩৬
উখরা, অণ্ডাল, বর্ধমান	সীতারাম	১৭৪০
তিলানন্দপাড়া, সবং, মেদিনীপুর	জানকী বল্লভ	১৮১১
বরাহনগর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	রামনাথেশ্বর	১৭৪১
কলাগাছিয়া, গোঘাট, হুগলী	রঘুনাথ	১৭৬২
পারুল, আরামবাগ, হুগলী	রঘুনাথ	১৭৬৮
উবদিপুর, খানাকুল, হুগলী	রঘুনাথ	১৭৬৮
ভালিয়া, আরামবাগ, হুগলী	রঘুনাথ	১৭৭২
মাধবপুর, আরামবাগ, হুগলী	রাম	১৭৭৯
কালনা, বর্ধমান	রামেশ্বর	১৭৮৩
ঘাটাল, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৭৯৭
কাদিলপুর, দাসপুর, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৭৯৯
নিমতলা, দাসপুর, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮০১
দিশপুর, ডেবরা, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮০৪
অলিঙ্গিরি, এগরা, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮১০
তিলানন্দপাড়া, সবং, মেদিনীপুর	জানকী বল্লভ	১৮১১
জনার্দনপুর, দাসপুর, মেদিনীপুর	সীতারাম	১৮১৪
পুঁড়শুঁড়া, হুগলী	রামচন্দ্র	১৭৫৩
মেদিনীপুর	রামচন্দ্র	১৮১৭
মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮৩৭
চিরুলা, এগরা, মেদিনীপুর	রামচন্দ্র	১৮৪৩
রাধাকান্তপুর, দাসপুর, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮৪৬
সাতক্ষীরা, খুলনা	রামসীতা	১৮৫১
বলরামপুর, ডেবরা, মেদিনীপুর	সীতারাম	১৯৬০-৬১
খারার, ঘাটাল, মেদিনীপুর	সীতারাম	১৮৬৪
মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮৬৭
মেদিনীপুর	সীতারাম	১৮৬৯
হুগলী	রঘুনাথ	১৮৭২-৭৬
আনন্দপুর, কেশপুর, মেদিনীপুর	রঘুনাথ	১৮৯৩



আগরতলায় বঙ্কিম স্মরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৭ জুন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রতিনিধি তথা ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রবীণ গবেষক ড. দেবাশিস মুখার্জি। বিশেষ বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন আগরতলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও লেখক ড. জগদীশ গণচৌধুরী। রাজকীয় আড়ম্বরপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে উপস্থিতিতে সভাগৃহ পরিপূর্ণ ছিল। বহু মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। ড. মুখার্জি তাঁর বক্তব্যে 'আজও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। পরদিন ২৮ জুন অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ত্রিপুরার উদয়পুর টাউন হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের কৃষি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রসেনজিৎ সিংহ রায়। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলার সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি পদ্মমোহন জামাতিয়া। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতলচন্দ্র মজুমদার। এখানেও প্রধান বক্তা রূপে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ড. দেবাশিস মুখার্জি। তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় স্তর তথা বঙ্গীয় সমাজ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা দেবাশিস নাথ।

ব্যারাকপুরে বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও রক্তদান শিবির

গত ৭ জুলাই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিলকান্দায় বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে শিশু ও বালকদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং পরে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ৪০ জন শিশু ও বালক-বালিকা অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং ৬৮ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র সহ-প্রচারক রমাপদ পাল এবং স্থানীয় কার্যকর্তারা।

পুরো অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন নব দিগন্ত ট্রাস্টের সভাপতি দিলীপ বিশ্বাস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্যারাকপুর খণ্ড সহ কার্যবাহ শম্ভু দাস।



তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ ইনসটিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন



গত ৬ জুলাই হাওড়া জেলার তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ ইনসটিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে সকাল থেকে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতের অমর পূজারি জাতীয় ঐক্য সংহতির প্রতীক ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৯ তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়। প্রসাদ তীর্থ সভাগৃহে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সহ ভিভিন্ন মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর ড. মুখার্জির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করেন নন্দলাল মণ্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পৃথ্বীশ কুমার সামন্ত, শিবশঙ্কর বেজ প্রমুখ। এর পরে বর্ষব্যাপী বৃক্ষরোপণের সূচনা করেন তাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোলাম খাঁ। তারপর শুরু হয় রক্তদান শিবির। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সাল থেকে দীর্ঘ ৩৫ বছর এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এবারে ১৮ জন মহিলা সহ ৬৭ জন রক্তদান করেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, এই শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত ৫ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসায় ব্যয়িত হয়। বিকেলে দ্বিতীয় পর্বে প্রসাদ স্মৃতি সরস্বতী শিশু মন্দিরের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি শিশির ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন তপন রীত।

প্রবীণ নাগরিক সম্মিলনীর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ৭ জুলাই কলকাতার প্রবীণ নাগরিক সম্মিলনী পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এবং ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির



জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে ভাবানীপুরে স্যার আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ নাগরিক সম্মিলনীর সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণ পাহাড়ি। ড. শ্যামাপ্রাসাদের কর্মজীবন ও জাতীয়তাবোধের বিষয়ে আলোকপাত করেন বিশিষ্ট লেখক ও সমাজসেবী বিনয়ভূষণ দাশ। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির পূর্বতন সভাপতি অসীম কুমার ঘোষ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ও ড. শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জিকে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ও পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা হিসেবে উল্লেখ করে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার সুরেশ প্রসাদ মজুমদার, কার্যকরী সভাপতি ড. অশোক কুমার ব্যানার্জি, সংগঠন সম্পাদক হরলাল মজুমদার, জীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দশজন বিশিষ্ট চিকিৎসককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

পাথুরিয়াঘাটা মল্লিক বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি উৎসব

সপ্তর্ষি ঘোষ

১৮৮৩ সালের একুশে জুলাই। বাঙ্গলা শ্রাবণ মাস। কৃষ্ণা প্রতিপদ। শনিবার। সদ্য অতিক্রান্ত পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতি। একটা গাড়ি এসে থামল উত্তর কলকাতার ৬৭ নম্বর পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিটের বাড়ির সামনে। গাড়ির মালিক অধরলাল সেন। তৎকালীন দাপুটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আরোহীদের মধ্যমণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। যে বাড়িতে তাঁরা এলেন, সেই বাড়ির কর্তা যদুলাল মল্লিক। ঠাকুরের আগমনের উদ্দেশ্য, মল্লিক পরিবারের কুলদেবী সিংহবাহিনী দর্শন।

এবার মল্লিক পরিবারের গৃহস্বামী যদুলাল মল্লিকের পরিচয় জেনে নেওয়া যাক। পাথুরিয়াঘাট মল্লিক পরিবারের আদিপুরুষ মতিলাল মল্লিক ছিলেন অপুত্রক। তিনি ও তাঁর পত্নী রঙ্গনমণি যদুলাল (১৮৪৪-১৮৯৪)-কে দত্তক নিয়েছিলেন। এক বর্ণময় চরিত্রের মানুষ ছিলেন যদুলাল। সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরেজি ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জনপ্রিয় ছিলেন বাগ্মীরূপে। একদিকে তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অন্যদিকে কলকাতা পুরসভার কমিশনার। সাবেক কলকাতা শহরের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। তদানীন্তন কলকাতায় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন যদুলাল। তাঁর দানশীলতা এবং বদান্যতা আজ প্রবাদপ্রতিম। এসব তো হলো তাঁর বাহ্যিক পরিচয়। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন ঘনিষ্ঠ গৃহী পার্ষদ। যদুলাল রামকৃষ্ণদেবকে 'ছোটো ভটচায্' বলে সম্বোধন করতেন। পারস্পরিক আলাপচারিতায় উভয়ই 'তুমি' সম্বোধন করতেন। দু'জনের মধ্যে ছিল এরকমই হৃদ্যতা।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আবার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে চলে আসি। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে ঠাকুরদালানে দেবী সিংহবাহিনীর পূজার স্থানে এলেন। চন্দন, ফুল ও মালায় দেবী যেন চিন্ময়ী রূপে আবির্ভূতা। দেবী মূর্তির সামনে কৃত্রিম আলোর ঔজ্জ্বল্য। টাকা ঠাকুরের কাছে ব্রাত্য, আবার দেবী দর্শনে এলে প্রণামী দিতে



হয়। একজন ভক্তকে বললেন, টাকা দিয়ে প্রণাম করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহবাহিনীর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি তন্ময় হয়ে মা-কে দর্শন করছেন। এভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যপ্রভায় সেদিন (১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই) পাথুরিয়াঘাট মল্লিক বাড়ির ঠাকুরদালান হয়েছিল বিভূষিত।

অবিকল পাথরের মূর্তির মতো নিষ্পন্দ, নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অপলক নয়নে। ভক্তরাও দেখছেন সেই দৃশ্য। এভাবেই অতিবাহিত হলো বেশ কিছুক্ষণ। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তাঁর সমাধি ভঙ্গ হলো। কেমন যেন নেশায় মাতোয়ারা তিনি। সিংহবাহিনীর উদ্দেশে বলছেন, 'মা, আসি গো'।

দেবী দর্শনের পরে তিনি চললেন গৃহকর্তা যদুলাল মল্লিকের বৈঠকখানায়। ভক্তরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। বৈঠকখানায় যেতে যেতে ঠাকুর নিজের মনে বলছেন, 'মা, আমার হৃদয়ে থাক মা'। ভাবে মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানায় ঢুকে গান শুরু করলেন, 'মাগো আনন্দময়ী হয়ে, আমায় নিরানন্দ করো না'। গান শেষ হলো। সমাধিস্থ অবস্থারও কিছুটা অবসান হলো। এবার তিনি যদুলালকে বললেন, 'আমি মা-র প্রসাদ খাব'। মা সিংহবাহিনীর প্রসাদ এনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেওয়া হলো। তিনি পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে প্রতি বছর একুশে জুলাই ৬৭ নম্বর পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিটে প্রাসাদোপম মল্লিক বাড়ির ঠাকুরদালানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি উৎসব' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজবৃন্দ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন। এ উৎসবে হাজির থাকেন শহরের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। সামগ্রিক ভাবে, সেদিন মল্লিক বাড়ির ঠাকুরদালানে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের বাতাবরণ তৈরি হয়। বিশেষ কারণবশত এ বছর ভাবসমাধি উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ২২ জুলাই সোমবার সন্ধ্যে ছ'টায়। আগ্রহী পাঠক শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিধন্য মল্লিকবাড়ির ঠাকুরদালান দেখে আসতে পারেন। ■

ভারতীয় নৃত্য-ঐতিহ্যের এক অনন্য মহাকাব্য বলরামভারতম্

কৌশিক রায়



কেরলের বর্তমান রাজধানী নগরী তিরুবনন্তপুরম-এর পূর্বতন নাম ছিল ত্রিবাঙ্কুর। ব্রিটিশ আমলে ত্রিবাঙ্কুর একটি দেশীয় রাজ্য হিসেবেও পরিচিত ছিল। ১৭২৯ সাল থেকে ১৭৫৮ সাল পর্যন্ত এই দেশীয় রাজ্যটির শাসনভার হাতে নেন রাজা মার্তণ্ড বর্মার ভ্রাতুষ্পুত্র— কার্তিক তিরুন্নাল রাম বর্মা। রাজা মুৎসুহিতোর উদ্যোগে জাপানে যেমন মধ্যযুগের আঁধার সরে গিয়ে উদারমনস্ক সংস্কৃতির সূর্য উদিত হয়েছিল, শার্লেমানের শাসনে ফ্রান্সে যেমন সংস্কৃতির জোয়ার এসেছিল, পুষ্যভূতি-রাজ হর্ষবর্ধন ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রাচীন ভারত যেমনভাবে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, তেমনি রাজা কার্তিক তিরুন্নাল রাম বর্মার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিবাঙ্কুর-সহ দক্ষিণ ভারতে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য-সহ সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে একটা নতুন জোয়ার এসেছিল। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র নামক গ্রন্থটি যেভাবে নাটক এবং অভিনয় শিল্পের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিল সবার সামনে, তেমনি রাজা কার্তিক তিরুন্নাল রাম বর্মার রচিত বলরামভারতম নামক গ্রন্থটিও ভারতীয় নৃত্যশৈলীর একটি চিরায়ত রূপ তুলে ধরে সকলের সামনে।

১৭৫৮ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রাজা কার্তিক তিরুন্নাল রাম বর্মা। প্রশাসনিক গুরুদায়িত্ব সামলেও 'দক্ষিণের ভোজরাজ' নামে সুপরিচিত রাজা কার্তিক তিরুন্নাল মালয়ালী সংস্কৃতি পুরুষ কাপ্পালিঙ্গাদ নাম্বুদ্রির সহায়তায় কথাকলি নৃত্যের একটি নব আঙ্গিকের প্রচলন করেন। মাণ্ডুর রাজা রাজবাহাদুর, সমুদ্রগুপ্ত, মিঞা তানসেনের মতো ত্রিবাঙ্কুরের এই নৃপতি ও সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র বিশারদ ছিলেন। কথাকলি নৃত্য ও আবহসঙ্গীতের মাধ্যমে ভারতীয় পুরাণের বিভিন্ন কাহিনির রূপায়ণের প্রচলন (আত্তাকাথা) করেন রাজা কার্তিক তিরুন্নাল। মালয়ালী কবি দেবরাজ রাজাকার্তিক তিরুন্নালের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন— ''এই রাজা যেন স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মতো, যিনি সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে তাঁর প্রতিভার বিকিরণের সাহায্যে মানবতাবাদকে নিয়ে এসেছেন।'' দেবরাজের এই প্রশস্তির সঙ্গে সমুদ্রগুপ্তের প্রশংসা করে লেখা, কবি হরিষেণের 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' শিলালিপিটির তুলনা করা চলে। নৃত্যশৈলীর ওপর 'বলরামভারতম্'-এর পাশাপাশি রাজা কার্তিক তিরুন্নাল আরও কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলি হলো 'রাজসূয়ম' 'সুভদ্রাহরণম', (কৃষ্ণের সুভদ্রাহরণ কাহিনি সম্পর্কিত), 'বকবধর্ম' (একচক্রা গ্রামে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের হাতে বকরাক্ষস বধের বৃত্তান্ত), 'গন্ধর্ববিজয়ম', 'পাঞ্চালীস্বয়ম্বরম্' (স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর অর্জুনকে বরমাল্য প্রদান), 'কল্যাণসৌগন্ধীকরম' এবং 'নরকাসুরবধম'। বর্তমানে কেরলের তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে, ভূর্জপত্র বা তাল পাতার ওপর সংস্কৃত ভাষাতে লেখা 'বলরামভারতম'-এর মূল পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত আছে। এই গ্রন্থটি ১৯৩৬ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কিউরেটর সম্ভাশিব শাস্ত্রীর উদ্যোগে প্রথম ছেপে বের হয়। এই গ্রন্থটির মধ্যে নৃত্যের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকমের অভিনব শৈলীর বিবরণও দেওয়া আছে। এই 'বলরামভারতম্' গ্রন্থটিতে আছে ২২২৮টি কাব্য পংক্তি এবং ২০টি গদ্য অনুচ্ছেদ। বিভিন্ন আঙ্গিকে এবং শারীরিক মুদ্রার সাহায্যে কীভাবে নানান রকমের নৃত্যনাট্যর উপস্থাপনা করতে হয় সেটারও বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে এই 'বলরামভারতম্' গ্রন্থে। কথাকলি নৃত্যশৈলী ছাড়াও এই গ্রন্থে রাজা কার্তিক তিরুন্নাল, অষ্টাদশ শতকে কেরল এবং দাক্ষিণাত্যের আরো কয়েকটি স্থানে প্রচলিত 'কুদিআট্টম্', 'কুথু', 'কৃষ্ণআট্টম্', 'থিরুভাথিরাক্কালি', 'কুম্মি', 'থুল্লাল' ও 'দাসিআট্টম'-এর মতো নৃত্যশৈলীগুলিরও বিশদ ব্যাখ্যা এবং পর্যালোচনা করেছেন। মহাকাব্য মহাভারত এবং রামায়ণ-এর কাহিনির ওপর ভিত্তি করে (প্রবন্ধম) 'কুথু' নৃত্যশৈলীটি কেরলের বহু মন্দিরে 'চাক্কিয়ার' সম্প্রদায়ের মানুষ প্রদর্শন করতেন। কেরলে একটি নারী সম্প্রদায় দেবী পার্বতীর লাস্য নৃত্যের ভঙ্গিমাতে 'থিরুভাথিরাক্কালি' নৃত্যশৈলীটি প্রদর্শন করতেন। এক্ষেত্রে এই নর্তকীরা, মগধের রাজা বিম্বিসারের সমসাময়িক রাজনর্তকী আম্রপালী, বাসবদত্তা ও বসন্তসেনার উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিতি পেতে পারেন।

রাজা কার্তিক তিরুন্নালের এই 'বলরামভারতম্' গ্রন্থটি থেকে জানা গেছে সপ্তদশ শতকে কথাকলি নৃত্যশৈলীর উদ্ভব হয় 'রামনাট্টম্' ও 'কোত্তারাক্কারা থাম্বুরন' নামক দুটি নৃত্যশৈলীর বিবর্তনের মাধ্যমে। কেরলে যে দেবদাসীদের মন্দির-নৃত্য বা 'দাসীআট্টম্' প্রচলিত ছিল— তার থেকেই 'মোহিনীআট্টম্' নামক নৃত্য ঘরানাটির উদ্ভব ঘটেছে বলে 'বলরামভারতম্' গ্রন্থটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কেরলের অন্তর্গত শচীন্দ্রম মন্দিরে 'দাসীআট্টম্' নৃত্য প্রদর্শিত হয়। অবশ্য, একক নৃত্যশৈলী 'মোহিনীআট্টম্' সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য পাওয়া যায় নৃত্য-বিশেষজ্ঞ মাঝমঙ্গলম্ নারায়ণন নাম্বুদ্রি বিরচিত 'ব্যবহারমালা' নামক গ্রন্থটি থেকে। তবে, দাক্ষিণাত্যের আরো কয়েকটি রাজ্যের নৃত্যশৈলী সম্পর্কে লিখেছেন রাজা কার্তিক তিরুন্নাল। এগুলির মধ্যে আছে কাল্লারি', 'দোলা' 'বক্রঙ্গিনাট্যম্', 'ভরতনাট্যম্', 'নিষাদনটনানম্'-এর মতো নৃত্যশৈলীগুলিও। তবে মালয়ালী সাহিত্য বিশ্লেষক মহাকবি উল্লুর পরমেশ্বর আইয়ার, তাঁর মহাগ্রন্থ- 'কেরালাসাহিত্যচরিতম্' এ জানিয়েছেন, রাজা কার্তিক তিরুন্নাল বলেছিলেন যে 'দাসীআট্টম্' নামক নৃত্যশৈলীর জন্ম কিন্তু কেরলে নয়, তামিলনাড়ুতে হয়েছিল। রাজা কার্তিক তিরুন্নাল-এর পুত্র ও পরবর্তী নৃপতি শ্রী স্বাতী তিরুন্নাল মহারাজার আমলে কেরলে মোহিনীআট্টম্ ও কথাকলির মতো নৃত্যশৈলীর আরও বিবর্তন ঘটে।



স্বর্ণগৈরিক অরুণকেতনই ভারতের রাষ্ট্রধ্বজ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

সূর্য হলো প্রাণের উৎস। সূর্য এক বলয়রূপ অগ্নিপিণ্ড। অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে। অগ্নি ও সূর্য জগতের প্রাণস্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। মূঢ়তা, দুষ্টতা, স্বার্থজনিত অজ্ঞান এবং সমস্তরকমের দুর্গুণ নষ্ট করে অন্তরস্থিত জ্ঞানের বিমল প্রকাশ আনয়নের পূর্ণার্থ প্রকাশ করে অগ্নি ও সূর্যের স্বর্ণগৈরিক রং।

বৈদিক জাগরণের অরুণকেতন ইন্দ্রের হাতে শোভা পেয়েছে। ভগবান রামচন্দ্র স্বর্ণগৈরিক ধ্বজকে উড্ডীয়মান রেখেছিলেন জগতের অপরিসীম কল্যাণের নিমিত্ত। স্বর্ণগৈরিকধ্বজ বারবার নীলাকাশের সুউচ্চে ঢেউ খেলে খেলে, দিক থেকে দিগন্তে আজও কল্যাণবার্তাবহনের সাক্ষী হয়ে আছে। বৈদিক ঋষিরা বার বার বিজ্ঞানের জয়মন্ত্রজপে সূর্যকে সাক্ষী রেখে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে আবিষ্কৃত জ্ঞানকে আরও সুদৃঢ় করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমাজ সংস্কারায়িত কাজের প্রতীকরূপে ভগবৎধ্বজরূপে স্বর্ণগৈরিক রঙের গরিমাকে অরুণকেতন হিসাবে জগতে আন্দোলিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যে অর্জুনের গতিযুক্ত রথেও ভগবৎধ্বজ শোভা পেয়েছে। রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী, ঝাঁসির রানিও স্বর্ণগৈরিক অরুণকেতন সুউচ্চে উড্ডীন করে গেছেন।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বহমান ভারতীয় দর্শন-সভ্যতা-সংস্কৃতির জনকল্যাণ নিমিত্ত আত্মাহুতির সাক্ষীরূপ স্বর্ণগৈরিক ধ্বজ আকাশে বাতাসে প্রাক্‌ইতিহাস ও ইতিহাসের গৌরবময় সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে আমাদের দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করে চলেছে।

জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতার শিক্ষা দেয়। মনের সমস্ত দুর্নীতির অবসান ঘটিয়ে হৃদয়কে তপ্তবর্ণের মতো নির্মল ও উজ্জ্বল করে তোলার শিক্ষালাভ করি 'দ্বিজিহ্ব' বিশিষ্ট অগ্নিদেবের কাছ থেকে। বেদে অগ্নির ধ্যান করার সময় তাঁকে 'দ্বিজিহ্ব' বলে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। যজ্ঞাগ্নির স্বরূপই হলো এই ধ্বজ। ত্রিকোণ যার আকার, জ্বলন্ত যজ্ঞশিখার মতোই যে আজও বহমান। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে যেখানে যতবারই আলোচনা হোক এবং যেভাবেই আলোচনা হোক— সেই আলোচনার মূল নির্যাস হবে, ত্যাগের আধারই আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি। জাতির জাগরণের, মিলনের ও সঙ্ঘবদ্ধতার প্রতীক হলো এই স্বর্ণগৈরিকধ্বজ।

সৎকর্ম, সৎকর্ম করার প্রেরণা এবং সেই প্রেরণাকে কার্যান্বিত করার ভাবনাই হলো ভারতবর্ষের ধর্ম। সেই ধর্মকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য আকাশে আন্দোলিত হয় আমাদের হৃদয়পূজ্য ভগবদ্‌ধ্বজ। ধর্মরক্ষার জন্য, বৈভবশালী ভারতকে রক্ষার জন্য, ভারতকে চিরন্তনভাবে সর্বগুণসম্পন্ন করে তোলার জন্য সে যেন আমাদের সতত আহ্বান করছে।

ভারতের জাতীয় পতাকার অনুসন্ধানে— রিপোর্ট অব দি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ কমিটি, ১৯৩১-এর সিদ্ধান্ত থেকে জানা যায় যে, 'গেরুয়া রং ভারতীয় পরম্পরার নির্দেশক। কেবলমাত্র গেরুয়া রং-ই ভারতীয় জনজীবনের ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এর একটি নিজস্ব আবেদন রয়েছে এবং তা ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুকূল।' এই ফ্ল্যাগ কমিটিতে ছিলেন— সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু, পট্টভি সীতারামাইয়া, ডাঃ হার্ডিকর, কাকাসাহেব কালেলকর, মাস্টার তারা সিংহ ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। নানা আলাপ আলোচনার পর সকলে ঐকমত্যে পৌঁছলেন যে, ভারতের জাতীয় পতাকা মাত্র একটি বর্ণের হবে এবং তা হবে গৈরিক রঙের। আর ধ্বজদণ্ডের পাশে উপরের দিকে থাকবে চরকার ছবি। ভারতীয় ইতিহাসের এক কলঙ্কময় ক্ষণে 'ফ্ল্যাগ কমিটি'র প্রতিবেদন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

একরঙা গেরুয়া পতাকার সিদ্ধান্ত নাকচ করে তেরঙা পতাকার সিদ্ধান্তকে অনেকে গুটি কয়েক ব্যক্তির ইচ্ছার কাছে ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরাজয় হয়েছিল বলে মনে করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রজ্বলিত আগুনের শিখা যেমন দাবিয়ে রাখা যায় না, সূর্যকে যেমনি তালুবন্দি করে রাখা যায় না, তেমনি ত্যাগমন্ত্রকেও নির্মূল করা কখনই সম্ভব নয়। স্বর্ণগৈরিক অরুণকেতন আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত অবস্থায় অবস্থান করছে। এই ভগবদ্‌ধ্বজ ভারতবাসীর হৃদয়ধ্বজ। এই ধ্বজের অণুতে অণুতে অঙ্কিত হয়ে আছে ভারতীয় পরম্পরা। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত জনকল্যাণের জন্য যেসব গৈরিক বসন পরিহিত সন্ন্যাসীগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের সেই উৎসর্গীকৃত কাজ কখনই বিফলে যায়নি, যাবেও না। পরম্পরাগত ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরাজয় হয় না। আর তা কখনই সম্ভব নয়। কারণ স্বর্ণগৈরিক রংই তা প্রমাণ করে চলেছে। ভারতের বর্তমান তেরঙা পতাকার শীর্ষে বিরাজ করছে সেই রং; সে জানাচ্ছে পরম্পরাগত ঐতিহ্য সবসময় শীর্ষেই থাকে। ভগবৎপ্রদীপ যেমন মন্দিরের গর্ভগৃহে সদা প্রজ্বলিত থাকে আর সেই মন্দিরের শীর্ষে থাকে ভগবৎধ্বজ, তেমনি পরম্পরাগতভাবে ভগবৎধ্বজকেও হৃদয়ের গর্ভগৃহে প্রজ্বলিত রেখে, শক্তহস্তবন্ধনীতে ধরে থাকতে হবে তার দণ্ড। সেটাই হবে স্বর্ণগৈরিক রূপ অরুণকেতনের আসল উড্ডীনতা। আর সুউচ্চে আন্দোলিত হতে থাকা ভগবৎধ্বজই চিরন্তনভাবে দেখিয়ে যাবে ভারতবর্ষের আগামী দিশা। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর



BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796



ধ্বংসের আগে রমনা কালীবাড়ি।

আন্তর্জাতিক

ধ্বংসপ্রাপ্ত ঢাকার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রমনা কালীবাড়ি

বরুণ দাস

একাত্তরের কালোদিন

ঢাকা মহানগরের বিখ্যাত রমনা ময়দানের সামনে আমাদের নামিয়ে দিলেন সিএনজি-র বর্ষীয়ান চালক। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ময়দান পেরিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম কালীবাড়ির সামনে। বিকেল গড়িয়ে তখন ঢাকা মহানগরের বুকে সবে সন্ধ্যা নেমেছে। সেই কিশোরী সন্ধ্যা গায়ে মেখে আমরা ঢুকে পড়ি কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে। ঢাকেশ্বরী, বাদরি আর রমনা কালীবাড়ি– দু'দিন এক অন্য আবহের মধ্যে আছি।

'আমাদের' বলতে বারাসাত-নিবাসী সফরসঙ্গী যাটোর্ধ্ব স্বরাজকুমার দত্ত, ঢাকায় আমাদের তরুণ গাইড তথা বাংলাদেশের ভূমিপুত্র মানিক চৌধুরী এবং এই প্রতিবেদক। উল্লেখ্য, ঢাকায় আমাদের ট্যুর সিডিউল তৈরি করে দিয়েছিলেন 'স্যার' তথা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাংলাদেশস্থ শাখা-সমূহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাজীবী অরুণচন্দ্র দাস। তিনিই মানিক চৌধুরীকে গাইড হিসেবে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ দিনটি বাংলাদেশের বাঙ্গালি তথা হিন্দু সমাজের কাছে কালোদিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ওইদিন রমনা কালীবাড়ি খুব ন্যক্কারজনকভাবে ধ্বংস করা হয়। ঐতিহাসিক রমনা কালীবাড়ি শুধু বাংলাদেশের হিন্দুদের কাছেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের হিন্দুদের কাছেও অত্যন্ত প্রিয় ও পবিত্র স্থান। মন্দিরের প্রাচীন ইতিহাস বলে, ১২০০ বছর আগে এই কালীমন্দির স্থাপিত হয়। ২৬ একর জায়গার ওপর রমনা কালীমন্দির। এরই একাংশে ঢাকার বিখ্যাত রেসকোর্স ময়দান। বর্তমানে যার নতুন নাম সোরাওয়ার্দি উদ্যান। উল্লেখ্য, কোনও জাতি বা দেশের ঐতিহ্য তার ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও সমান সম্পৃক্ত। কোনও দেশের সরকার তার ধর্মীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানগুলি রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার সেগুলি ধ্বংস করতে ব্যস্ত। এমনই অভিযোগ মন্দির কর্তৃপক্ষের।

মন্দির কর্তৃপক্ষ আরও জানান, বাংলাদেশ সরকার গঠন হওয়ার পর সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন—পাকসেনাদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত রমনা কালীবাড়ি পুনর্গঠনের জন্য। তিন মাসের মধ্যে রমনা কালীবাড়ি পুনর্গঠনের আশ্বাস দিয়েছিলেন শেখ সাহেব। কিন্তু স্বাধীন দেশের 'প্রগতিশীল সরকার' রাতারাতি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় রমনা কালীবাড়ি। ফলে মন্দিরের স্থাবর–অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি হস্তান্তর হয়। এখানেই শেষ নয়, যারা রমনা কালীবাড়ি পুনর্গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন, তাঁদের 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দেওয়া হয়। শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কালীমন্দিরের জমি আওয়ামি লিগ সরকার ছিনিয়ে নেয়। সংসদে একটি নতুন বিল পাশ করে মন্দিরের বিশাল জমি রাতারাতি রেসকোর্সের মাঠে রূপান্তরিত হয়।

রমনা থানা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক কালীমন্দির। ইতিহাসকে গায়ের জোরে অস্বীকার করলেই কি সে তার বাস্তবতা হারায়? কখনও নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো, রমনা কালীমন্দিরের অনেক পর রমনা থানা এবং রমনা পার্কের নামকরণ হয়। পুরনো দলিল-দস্তাবেজ খুঁজলেই এর সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতাসীন সরকার নাছোড়বান্দা হলে সংখ্যালঘু মানুষের উপায় কী!

মূল মন্দিরে শ্রীশ্রীকালীমাতার বিশাল মাপের মূর্তি। তার পাশের মন্দিরে সপরিবারে মা দুর্গা। তার পাশে শ্রীশ্রীলোকনাথ ঠাকুর, আনন্দময়ী মা তারার মন্দির ও মূর্তি। আরও কিছুটা ডানে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের মূর্তি ও মন্দির। ফরিদপুর জেলার ওরাকান্দিতে যাঁর আদি পীঠস্থান। রমনা কালীবাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে লোকনাথ ঠাকুর, আনন্দময়ী মা আর হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের মূর্তি ও মন্দির।

প্রাচীন ও পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সহাবস্থান। পুরাণ আর ইতিহাস যেন একই সঙ্গে অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীলোকনাথ ঠাকুর, আনন্দময়ী মা কিম্বা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন মূলত আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। কানে এলো ঢাক-ঢোল-শিঙার পরিচিত আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি, মন্দিরের বাঁদিকে একদল

মতুয়া-ভক্ত অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ঢাক-ঢোল-শিঙা বাজাতে মগ্ন।

কালীবাড়ির পুরনো ইতিহাস ঃ ফিরে যাই কিছুটা পিছনে। রমনা কালীবাড়ির পুরনো ইতিহাস বলে, এখনকার কালীমন্দির হাল-আমলের। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক মূল মন্দির আগে দোতলা বাড়ি ছিল। দোতলার মাঝের ঘরে দেবী ভদ্রকালী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। আর দেবী ভদ্রকালীর ডানদিকে অধিষ্ঠিতা ছিলেন ভাওয়াল কালী। ওপরে দক্ষিণদিকে ছিল প্রশস্ত বারান্দা। ঠিক তার পরেই ছিল দেবীর মূল মন্দির। সেসব প্রাচীন কাঠামো আজ কোথায়!

কালীবাড়ির পুরনো ইতিহাসের পাতা ওলটাই, পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে পর পর সারিবদ্ধ ভাবে ভক্তদের থাকার ঘর ছিল। এছাড়া দ্বিতল বাড়ির অন্য তলের পূর্বদিকে ছিল দু'টি রান্নার ঘর। যার একটিতে সাধারণ সবজি ও অন্যটিতে প্রোটিন-সমৃদ্ধ অন্ন-প্রসাদ তৈরি করতেন মন্দিরের স্থায়ী পাচকেরা। মন্দির-বাড়ির গঠন-পদ্ধতি এমনই নিখুঁত ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল যে, দূর থেকে এদের সহজেই দেখা যেত।

এখানেই শেষ নয়। এছাড়াও বিশাল প্রবেশদ্বারের কাছে ছিল একটি বড়ো মাপের নাটমন্দির। গেটের বাইরে দু'দিকে ইটের সুন্দর বেঞ্চ ছিল যাতে ভক্তরা আরামে বসতে পারেন। মন্দির প্রাঙ্গণের বাঁদিকে ছিল আর একটি একতলা বাড়ি। এর অনতি-দূরেই ছিল দশনামা শিবমন্দির। এর কাছেই আবার প্রশস্ত শান-বাঁধানো জায়গা ছিল। মূল মন্দিরের কাছেই শিবমন্দিরের পশ্চিমদিকে আরও দু'টি পাকা বাড়ি।

ইতিহাসের বিবর্ণ পাতা ধরেই এগুতে থাকি। মন্দির এবং উঠানের চারদিক উঁচু প্রাচীর বা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। মন্দিরের উঠোন সংলগ্ন স্থানে মহিলা ও পুরুষদের থাকার জন্য আরও দু'টি পাকা বাড়ি ছিল। এই দুই বাড়ির মাঝখানে একটি দেওয়াল ছিল যার ভিতরকার দরজা দিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি সহজেই যাতায়াত করা যেত। আর প্রাঙ্গণের প্রশস্ত ভূমিতে ছিল মূল্যবান সব গাছগাছালি। এখন যার চিহ্নমাত্র নেই।

হরিদ্বারের গিরিরাজ গোস্বামী ঃ হরিদ্বারের গিরিরাজ গোস্বামীর মতে, ঢাকার রমনা কালীবাড়ি মন্দির নির্মাণ করেন বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্ক শূর। এই অঞ্চলের দু'দিক দিয়ে মেঘনা-যমুনা বয়ে যেত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তদের দ্বারা এই ঐতিহ্যবাহী কালীমন্দির উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বর্ধমান ও দিনাজপুরের রাজা, রানি ভবানি-সহ আরও অনেক রাজা ও জমিদার এই প্রাচীন মন্দিরের প্রয়োজনীয় সারাই ও সংস্কার করেছেন। জানা যায়, এই মন্দিরের ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকেরা দেব-দেবীর সেবাকাজেই শুধু নিজেদের যুক্ত রাখেননি, দেশের কাজের জন্যও তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে এঁদের গৌরবময় ভূমিকা অনস্বীকার্য। সন্ন্যাসীরা ছিলেন স্বাধীনতাকামী মানসিকতার। তাঁরাই এখানে শাসন করতেন। অখণ্ড ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত জাগ্রত দেবীর কৃপালাভের জন্য এখানে আসতেন।

মন্দিরের ইতিহাস বলে, স্বামী প্রেমানন্দগিরি এই মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই পণ্ডিতপ্রবর আধ্যাত্মিক মানুষটি অত্যন্ত উদার ও উচ্চ মনের ছিলেন। কোনও রকম সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাঁর কাছে সমান ছিলেন। এই মন্দিরটি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ডমিন্যান্ট রোল পালন করেছিল।

মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস থেকে আরও জানা যায়, মন্দিরের অন্যান্য ভক্তদের কথা অগ্রাহ্য করে অধ্যক্ষ মহারাজ স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। পাকসেনারা খবর পেয়ে ভয়ানক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মন্দিরে হানা দেয় এবং ২৫ মার্চের পর ইউনিভার্সিটি চত্বরের যে সমস্ত মানুষ জীবন বাঁচাতে এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের সবাইকে বর্বর ও হিংস্র পাকসেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে। মন্দিরের সমস্ত আবাসিকেরা মূল মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই ভেবে যে, পাকসেনারা এই মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করবে না। কিন্তু বর্বর ও অত্যাচারী পাকসেনারা চারদিক থেকে মন্দির ঘিরে ফেলে এবং আবাসিকদের ওপর থেকে নীচে নেমে আসতে নির্দেশ দেয়। তারপর সবাইকে সারিবদ্ধ ভাবে লাইনে দাঁড় করায়। মন্দিরের অধ্যক্ষকে চিহ্নিত করে তাঁর মাথা ও পেট গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়।

এবার বর্বর পাকসেনাদের হাতের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ঘুরে যায় কালীমন্দিরের বাকি নিরপরাধ ও নিরস্ত্র আবাসিকদের দিকে। তাদের সবাইকেও নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়। এরপর তারা কালীমন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং আকাশ-চুম্বি মন্দিরচূড়ো সেই আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবেই ১২০০ বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী আগুনের লেলিহান শিখায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বেগ ঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঐতিহ্য রক্ষণ বিভাগ এ খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাদের বার্তা পৌঁছয় খোদ পাকিস্তানের শাসকের কাছে। পাকসেনাদের বর্বরোচিত আচরণে দুঃখ প্রকাশ করেন পাকিস্তানের উঁচুমহলের কর্তাব্যক্তিরা। প্রতিশ্রুতি দেন মন্দির পুনর্গঠনের। কিন্তু স্বাধীন দেশের আওয়ামি লিগ সরকার বুলডোজার দিয়ে রমনা কালীমন্দির সম্পূর্ণভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার যে কাজটি করেন তার কোনও প্রতিকার হয়নি আজও।

ইতিহাসের ক্লেদাক্ত পথ পেরিয়ে ফিরে আসি বর্তমানে। সাদামাটা শেডের নীচে বড়োমাপের কালীমূর্তি। আমরা দাঁড়িয়ে আছি তাঁরই সামনে। যে ইতিহাসের ধূসর পাতা উলটালাম এতক্ষণ, তা শুধুই ধ্বংসের। একদল নির্মাণ করেন, আর একদল ধ্বংস করে। নির্মাণ ও ধ্বংসের এই খেলা সারা বিশ্ব জুড়েই। আফগানিস্থানের হিংসাদীর্ণ তালিবানি ইতিহাস আমাদের সভ্যতার চাকা পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

এবার ডেরায় ফেরার পালা ঃ আবার সিএনজি-র সন্ধানে আমরা তিনজন। এবার টিকাটুলি ফেরার পালা। রাজধানী ঢাকায় আমাদের অস্থায়ী আস্তানা। সন্ধ্যা-পেরুনো রাত তখন ঢাকা মহানগরের বুকে জাঁকিয়ে বসেছে। আকাশে অজস্র তারার মেলা। সময়টা এখন পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ঠিক মাঝামাঝি। গতকাল ছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা মতে, ওঙ্কার পঞ্চমী। লিপ-ইয়ার বলেই আজ ফেব্রুয়ারির শেষদিনটিতে দাঁড়িয়ে আমরা।

রাতে টিকাটুলির দিকে কোনও সিএনজি-চালকই যেতে চায় না। গোটা রাস্তাটাই জ্যাম-জটে পূর্ণ। কলকাতাকেও হার মানায়। গতকাল গ্রন্থমেলা থেকে ফেরার সময়ও সিএনজি পাইনি। ফলে রিকশাই একমাত্র ভরসা। কথা চালাচালির পর দেড়শো টাকায় রফা হলো আমাদের সফরসঙ্গী মানিকের সঙ্গে। এখানে দরদাম করার একটা রেওয়াজ আছে দেখলাম। এমন কী, দুরপাল্লা তো বটেই, কাছে-পিঠের বাসভাড়ার ক্ষেত্রেও।

কেন যে ধর্মীয় স্থানই মৌলবাদীদের প্রধান লক্ষ্য ঃ উল্লেখ্য, গতকাল দেখে এসেছি আর এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ঢাকেশ্বরী কালীমন্দির। এই মন্দিরের ইতিহাসও বড়ো ঘটনাবহুল। অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে মন্দিরের ওপর দিয়ে। বারবার হামলার শিকার এই প্রাচীন মন্দির। পাকিস্তান আমলেও রেহাই পায়নি, স্বাধীন বাংলাদেশেও বার বার আঘাত নেমে এসেছে। বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের সময় অনেকটাই ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয় প্রাচীন ঢাকেশ্বরী মন্দির। ■

চার মাসের বাজেটে সময়ের বিস্তীর্ণ রূপরেখা

শেখর সেনগুপ্ত

ভিন্নগোত্রীয় কৌতূহল একটা ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে একজন মহিলা বিত্তমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে বাজেট পেশ করেছিলেন। তারপর এই আর একজন—শ্রীযুক্তা নির্মলা সীতারমন। আমাদের দেশে বাজেট মানেই হরেক প্রত্যাশার আছাড়ি-পিছাড়ি, কলরোল এবং কলকাকলি। বাহারে-বিন্যাসে তাই প্রায়শ এক ধরনের প্রয়াস থাকে বিত্তমন্ত্রীর বাস্তবের ওপর যথাসাধ্য জনমোহিনী পালিশকে চকচকে দেখাবার। নির্মলা সীতারমনকে ধন্যবাদ, তিনি তা করেননি। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দে শুনতে পেয়েছি বাস্তবের প্রতি প্রত্যয় বা দেশকে উচ্চস্তরে পৌঁছে দেবার দৃঢ় শপথ।

এই রকম একটি বাজেটকে সংসদে উপস্থাপিত করবার মতো পরিবেশও ছিল আদ্যন্ত অনুকূল। নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সদ্য সদ্য যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে পার্লামেন্টকে নিয়ে এসেছে নিজেদের কবজায়, সেখানে বিরোধীদের মতিগতিও আর আমজনতার নিকট ধর্তব্যের বিষয় নয়। এই রকম শুভ আবহে আগামী আট মাসের জন্য রচিত বাজেট আর যাই হোক, অন্তত বিরোধিতার শঙ্কায় বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। পশ্চিমবঙ্গের মতো গুটি কয়েক রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু সরকার সমালোচনার স্রোত অবিশ্রান্ত রাখলেও নির্মলা সীতারমনের মেধা ও অবদানে তা মোটা দাগের কোনও রেখাপাতেও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই বাজেট চিহ্নিত করছে ভবিষ্যৎ ভারতের আর্থিক বুনিয়াদকে। কয়েক বছর পিছিয়ে গেলে বিষয়টা বোঝাতে সহজ হবে। ২০১৪ তে সংসদে গৃহীত বাজেট মোতাবেক ভারতের অর্থনীতির পরিধি ছিল সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। কিছু দিন আগে ওই পরিমাপ দাঁড়িয়েছিল ২ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকায়। আর এখন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বিত্তমন্ত্রী জানালেন, ২০১৯-২০ সালের আর্থিক বছরে ওই বৃত্ত প্রসারিত হতে হতে ছাড়িয়ে যাবে ৩ লক্ষ হাজার কোটি টাকাকেও। এমত বিস্তারকে বাস্তবায়িত করতে সরকার যাঁদের ওপর চাপ বাড়াবেন, তাঁরা মুখ্যত অতি উচ্চ আয়সম্পন্ন নাগরিক। বছরে যাঁদের উপার্জন ২ কোটি টাক থেকে ৫ কোটি টাকা বা তারও বেশি, তাঁদের করের ওপর অতিরিক্ত ৩ থেকে ৭ শতাংশ অবধি সারচার্জ আদায় করা হবে। সুতরাং এই স্তরের ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হলেও হতে পারেন। সরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে আরও সমর্থ তথা ঋণদানে আগ্রহী করে তুলতে এই বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৭০ হাজার কোটি টাকার বাড়তি অনুদান। ঋণের জন্য আবেদনপত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলি যাতে নিজেদের কর্তব্যসাধনে তৎপরতা দেখাতে পারে, বিত্তমন্ত্রী তার ওপর জোর দিয়েছেন। ঋণ সম্পর্কে নিজের যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত জানাতে ব্যাঙ্কগুলির দীর্ঘসূত্রতা সুবিদিত। অতঃপর সরকারের ওপর নজর এখানে থাকবে বলে আশা করতে পারি। এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের শিক্ষানীতিরও একটি রূপরেখা আমরা দেখতে পেলাম। ইন্টারনেট অব থিংস, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স, বিগ ডাটা ইত্যাদি অত্যাধুনিক শিক্ষায় ভারতীয় ছেলে-মেয়েরা যাতে বিশেষ দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন, তার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করবেন সরকার।

নির্মলা সীতারমন বিশেষ মান্যতা দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মণ্যের সমীক্ষাকে যা পেশ করা হয়েছিল বাজেট প্রস্তাব পাঠের ঠিক একদিন আগে। সেই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের মধ্যে হিন্দুস্তান ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে বিচরণ করবে। অর্থমন্ত্রী তদনুযায়ী প্রতিবছর বৃদ্ধির হারকে ৮ শতাংশে নিয়ে যেতে চান।

রিপোর্ট শুনতে শুনতে একটা অভিনব প্রস্তাব পেলাম এবং তা বেশ আমাকে নাড়াও দিয়ে গেল। মোদীজী গান্ধীবাদের প্রতি যে কতটা আকৃষ্ট, তার সবুদ এই প্রস্তাব। বাজেটে বলা হয়েছে, মহত্মাজীর সার্ধ জন্মশতবর্ষে সরকার গড়ে তুলবেন 'গান্ধী-পিডিয়া'—যার প্রকাশ ও ব্যাপ্তিতে থাকবে 'এনসাইক্লোপিডিয়া'র ধাঁচ।

কর্পোরেট ট্যাক্স আদায়ে সরকারি নজরদারি ও তৎপরতাকে তুঙ্গে তোলার কথা বলা হয়েছে। বছরে ৪০০ কোটি টাকার নীচে যে সমস্ত সংস্থার টার্নওভার, তাদের স্থান হবে ২৫ শতাংশ কর্পোরেট ট্যাক্সের নীচে অবস্থানরতদের দলে। ফলে দেখা যাবে যে দেশের ৯৯.৩ শতাংশ কোম্পানিই এই সুবিধা পাবে।

আয়কর নিয়ে মধ্যবিত্তের আগ্রহ সর্বাধিক। নির্মলা সীতারমন কিন্তু এক্ষেত্রে পীযূষ গোয়েলের ফর্মূলাকেই প্রায় অক্ষুন্ন রাখলেন। ওই স্বল্পকালীন বাজেটে প্রবীণ নাগরিকরা যে সমস্ত সুবিধালাভের অধিকারী ছিলেন, সেইগুলি অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। তবে আর্থিক লেনদেনকে আরও বেশি ইলেকট্রনিক করবার মানসে নতুন এক আইন চালু হতে চলেছে। অতঃপর যারা বছরে নগদে এককোটি টাকার বেশি তুলবেন, তাঁদের কাছ থেকে ২ শতাংশ কর আদায় করে নেবেন সরকার। মহিলা বিত্তমন্ত্রী চাইছেন, দেশের কর্মসংস্থানে মহিলাদের যেন আরও বেশি সুযোগ দেওয়া হয়। মেয়েরা, মায়েরা উপযুক্ত মর্যাদা না পেলে, এ দেশের যথার্থ উন্নয়ন অসম্ভব। তিনি পরিষ্কার উচ্চারণও করলেন, 'নারী তু নারায়ণী'। উন্নয়নের অনেক শপথ এই বাজেট প্রস্তাবে। ২০২৪ সনের মধ্যে ভারতের প্রতিটি গ্রামীণ আবসনে জলাভাব থাকবে না। ৩০ হাজার কিলোমিটার পথ নির্মিত হবে। ১৭টি বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। খেলাধুলায় হিন্দুস্তানকে আরও উচুতে তুলে ধরবার জন্য অর্থাভাব হবে না 'খেলো ইন্ডিয়া'র। অবসরপ্রাপ্ত অসংগঠিত শ্রমিকরা অবসর নেবার পর ৩ হাজার টাকা করে মাসিক পেনশন পাবেন। বিমায় ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগকেও রুদ্ধ করা হবে না। ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা আসবে বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে। ৪৫ লক্ষ টাকা অবধি গৃহ ঋণে দেয় সুদের অঙ্ক ৩.৫ লক্ষ টাকা হবে সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত। আয়কর প্রদানে প্যানকার্ডের বদলে আপনি আধারকার্ডও ব্যবহার করতে পারবেন। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে কর্মসংস্থান। সরকার বেকারিত্বের বিরুদ্ধে এই বাজেটের মাধ্যমে জেহাদ ঘোষণা করে দিলেন। আরও বহুবিধ সুবিধা। তবে কিছু দুর্ভাবনার স্থানও রয়েছে। পেট্রোলের ওপর ১ শতাংশ কর বৃদ্ধি দেশের মূল্যস্তরকে খানিক বেসামাল করবে বলে আশঙ্কা। কিন্তু ইতিমধ্যে ভরতুকিহীন গ্যাস সিলিন্ডারে যে একশো টাকা মূল্য কমানো হয়েছে, তাতে ওই পেট্রোলের দরবৃদ্ধির প্রভাবকে নিশ্চিত লঘুই মনে হবে মধ্যবিত্তের।

পুতলীবাঈ ও কুসুম কুমারী দাশ

গান্ধীজী যিনি বাপু নামে সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র ছিলেন, তাঁর মায়ের নাম পুতলীবাঈ। দ্য হ্যান্ড দ্যাটস্ রকস্ দ্য ক্রেডেল, রুলস্ দ্য ওয়ার্ল্ড প্রবাদবাক্যটি যে কোনো মনীষী জননীর মতো পুতলীবাঈ সম্পর্কেও উপযুক্ত। শৈশবে মায়ের প্রভাব গান্ধীজীর সমগ্র জীবনেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। পুতলীবাঈ বৈশ্য গুজরাটি সম্প্রদায়ভুক্ত



পুতলীবাঈ



কুসুম কুমারী

পরিবারের কন্যা। তাঁর পিতৃগৃহে ধর্মের পবিত্র ঐতিহ্য কঠোর ভাবেই পালিত হতো। তিনি সমগ্র জীবনে সেই আদর্শই অনুসরণ করে গেছেন। পুতলীবাঈয়ের জন্ম হয় ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। বিয়ে হয় করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে। পুতলীবাঈ ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী ও গুণবতী। তিনি যেমন বহির্জগতে রাজন্যবর্গের সমাবেশে স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তেমনই সাবলীল ছিলেন পরিবার ও গৃহকর্মে। তবে তাঁর নিজের ঘর-পরিবারই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্ব পেত। সন্তানদের জন্য তিনি কঠোর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি রাত-দিন তার সেবায় বিনিদ্র থাকতেন। ব্যক্তিগত সাজসজ্জার ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদাসীন। মূল্যবান পোশাকপরিচ্ছদ তিনি পরিহার করে চলতেন। ত্যাগ, ব্রত ও উপবাস ঘিরে তাঁর জীবনচক্র আবর্তিত হতো। মন্দির ও ঘর দুই স্থানেই তিনি তাঁর অবস্থানের সময়সীমা ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাঁর এই পবিত্র জীবনচর্যা তাঁর সন্তানদের কাছেও অনুকরণীয় ছিল।

মাঝে মাঝে তিনি প্রতিজ্ঞা করতেন কোকিলের ডাক না শুনে কোনো খাদ্যগ্রহণ করবেন না। এমনকী জলও নয়। একদিন অনেকক্ষণ অতিবাহিত হলেও কোকিলের ডাক শুনতে পেলেন না। বালক মোহন দাস দীর্ঘক্ষণ মাকে উপবাসী দেখে ব্যথিত হন। তিনি তখন বাড়ির পিছনে গিয়ে কোকিলের স্বরে কয়েকবার ডেকে মাকে এসে বলেন যে কোকিলের ডাক শোনা গেছে। বেশিক্ষণ উপোস করে থেকে মায়ের যাতে কিছু না হয়ে যায় তাই ছোট্ট মোহন এই চাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন। যদিও তিনি মায়ের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। মা কঠোর ভাবে বলেন, তিনি কী পাপে এমন মিথ্যাবাদী পুত্রের মা হয়েছেন। তারপরেই তিনি বালক মোহনকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে, সে আর জীবনে কোনোদিন মিথ্যেকথা না বলে। গান্ধীজী সারাজীবন মায়ের কাছে করা সেই প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন।

কবি জীবনানন্দ দাশের জননী কুসুম কুমারী দাশ। রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্যে এক আলোকস্তম্ভ ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। কাব্য প্রতিভা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন জননী কুসুম কুমারী দেবীর কাছে। কুসুম কুমারী বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে উনিশ বছর বয়সে সত্যানন্দ দাশের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর পুত্র-কন্যার নাম-- জীবনানন্দ, অশোকানন্দ ও সুচরিতা। কুসুম কুমারী দেবীব প্রধানত মুকুল, ব্রহ্মবাদী ও প্রবাসী পত্রিকায় লিখতেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র সংরক্ষণ করে রাখতেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আদর্শ ছেলে'-র দুটি পঙক্তি আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে — ' আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে।' ঘর সংসারের কাজকর্ম, কবিতা লেখা ছাড়াও ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যা হিসেবে বরিশালের নানান সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে তিনি জড়িত ছিলেন।

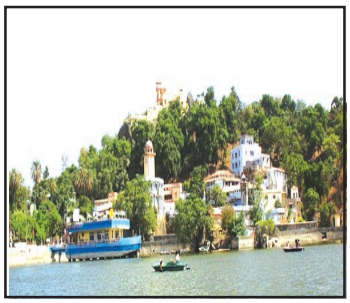
১৩১৯ থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ তিনি মহিলাদের দিবাভাগের প্রার্থনাসভার আচার্যা হিসেবে দয়িত্ব পালন করেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্মেলনের আচার্যার দায়িত্বও পালন করেছেন। বরিশাল মহিলা সভার সম্পাদিকা ছিলেন। দরিদ্র কন্যাদের নানাভাবে সাহায্য করা, ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষিত করা, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হওয়া, সর্বোপরি অন্তঃপুরেও মেয়েদের নানা গার্হস্থ্যকর্ম শিক্ষা দেওয়া মহিলা সভার কাজ ছিল। তাঁর 'খোকার বিড়ালছানা' কবিতায় তিনি শিশু ও বিড়ালছানার সম্পর্ক এভাবে বর্ণনা করেছেন—

সোনার ছেলে খোকামণি, তিনটে বিড়াল তার
একদণ্ড নাহি তাদের করবে চোখের আড়।
'সোনামুখী', 'সোহাগিনী', 'চাঁদের কণা' ব'লে
ডাকে খোকা, ছানাগুলি যায় আদরে গ'লে।

রূপশ্রী দত্ত

ভারতের পথে পথে

আবু পাহাড়



আরাবল্লী পর্বতে দক্ষিণ প্রান্তে ১২১৯ মিটার উচ্চতায় বিচিত্র আকারের গ্র্যানাইট পাথর ও সবুজ বনানীতে ঘেরা দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে ২২ × ৫ কিলোমিটার ব্যাপ্ত এলাকা জুড়ে সুন্দর পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস আবু পাহাড়। ভারতের শৈল শহরগুলির মধ্যে আবু পাহাড় অনবদ্য। আগেকার রাজা মহারাজারা গ্রীষ্মকালটা অতিবাহিত করতেন আবু পাহাড়ে। রাজস্থান ও গুজরাট সীমান্তের এই শৈলশহরটি পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। মধ্যযুগীয় মন্দির ভাস্কর্যও আবুর অন্যতম আকর্ষণ। শহরের চার কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে আমগাছে ঘেরা পাহাড়ে শ্বেতপাথরের দিলওয়ারা। এখানে রয়েছে আদিনাথ, নেমিনাথ, মহাবীর, ঋষভদেব ও পার্শ্বনাথের মন্দির। ১৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে আরাবল্লীর সর্বোচ্চ শিখর গুরুশিখর। এখানে রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মন্দির। কাছেই রয়েছে সেনানিবাস, অচলেশ্বর শিব মন্দির, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারীর মূল কেন্দ্র মন্দির, অধরাদেবীর মন্দির, বশিষ্ঠমুনির আশ্রম ও যজ্ঞস্থল ইত্যাদি।

জানো কি?

ভারতে কোন রাজ্যে কত জেলা

অরুণাচল প্রদেশ- ২১, মণিপুর-১৬, কেরালা-১৪, উত্তরাখণ্ড-১৩, অন্ধ্রপ্রদেশ-১৩, দিল্লি-১১, নাগাল্যান্ড-১১, মেঘালয়-১১, মিজোরাম-৮, ত্রিপুরা-৮, সিকিম-৪, পুদুচেরী-০৪, আন্দামান ও নিকোবর-০৩, গোয়া-০২।

বর্তমানে ভারতে মোট জেলার সংখ্যা-৭১৩।

ভালো কথা

রথ ও উলটো রথের মজা

এবারে রথ ও উলটো রথের দিন দুদিনই ভারী মজা হয়েছে। রথের একদিন আগে অমিতদা শাখায় বলে দিয়েছিল ওদের বাড়ির রথে সবাইকে থাকতে হবে। সেই মতো আমরা অনেক আগে থেকেই অমিতদাদের বাড়িতে পৌঁছে যাই। সাবাই মিলে রথটাকে সুন্দর করে সাজানো হলো। তারপর রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে বসানো হলো। তারপর রামমন্দির, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি হয়ে অনেক রাস্তা ঘুরে ফিরে এলাম। রাস্তায় অনেক লোক রথের দড়ি টেনেছে। অনেক লোক প্রণাম করে টাকা দিয়েছে। আমরা চিৎকার করে জয় জগন্নাথ বলছিলাম। উলটো রথের দিনও ওই ভাবেই রথ নিয়ে ঘুরেছি। শেষে অমিতদাদের বাড়িতে বড়ো বড়ো পাঁপড় ভাজা, পিঁয়াজি আর মিষ্টি খেয়ে যে যার বাড়ি চলে আসি। এত মজা হলো যে বলে শেষ করা যাবে না।

বিজয় দাস, পঞ্চম শ্রেণী, টিপি রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) র নী বী জ	(১) স ল হী হা ন য় ম্ব স
(২) হ র স রা	(২) রী ং গ র কা স ক্ষা যো

১৭ জুন সংখ্যার উত্তর
(১) বাজারদর (২) মানবশিশু

১৭ জুন সংখ্যার উত্তর
(১) নিরাপত্তাবাহিনী (২) বসন্তসমাগম

উত্তরদাতার নাম

(১) আদৃতা দলই, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূঃ মেদিনীপুর। (২) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি (৩) সমন্বিতা সাহা, মঙ্গলবাড়ি, মালদা। (৪) আকাশ বাসফোড়, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ৩১ ।।



কোপায় ব্রাজিল, ফিফাতে যুক্তরাষ্ট্র

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার কোপা আমেরিকা সেরা হলো নান্দনিক ফুটবলের তীর্থ ব্রাজিল। আর ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত মহিলাদের ফিফা বিশ্বকাপ চতুর্থবারের মতো জিতে অনন্য নজির সৃষ্টি করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একই গোলার্ধের দুটি দেশ বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুটি টুর্নামেন্ট জিতে আত্মগর্বে বলীয়ান ইউরোপের মুখে ঝামা ঘসে দিল। অবশ্য কোপা আমেরিকায় ইউরোপের কোনো দেশ খেলেনি। খেলার কথাও নয়।

মহিলা বিশ্বকাপে প্রতিটি ম্যাচই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নিয়ে খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমেরিকা তাদের পুরুষ সকার টিমকে বিশেষ বার্তা দিয়ে গেল। পুরুষদের টিম ৭/৮ বার বিশ্বকাপের



মূলপর্বে খেলেছে কিন্তু কোনোবারই কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকাতে পারেনি। সেই ১৯৫০ সালে শক্তিশালী ইংল্যান্ডকে হারিয়ে যে চমক দিয়েছিল মার্কিন সকার টিম, সেই চমকের ধারা পরবর্তী পর্যায়ে সেভাবে ধরে রাখতে পারেনি। যদিও সাম্প্রতিক কয়েকটি বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শক্তিশালী দলগুলোর সঙ্গে যথেষ্ট লড়াই করে হার স্বীকার করেছে। ১৯৯৪-তে যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের বিশ্বকাপ হওয়ার সুবাদে সে দেশে সর্বত্র ফুটবলের উৎকর্ষমণ্ডিত সব পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। প্রচুর অর্থের বিনিয়োগ হয় বহুজাতিক শিল্পসংস্থাগুলির তরফে। বস্তুত তারপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত খেলার পাশাপাশি ফুটবলেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে সে দেশের মহিলা দলের অত্যাশ্চর্য সব সাফল্যে। গত ২০ বছরে যুক্তরাষ্ট্র তিনবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ব্রাজিল যে উচ্চতায় নিয়ে গেছে তাদের সকার ঐতিহ্য ও গৌরবকে, মহিলা বিভাগে সেই একই জায়গায় বিরাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। ব্রাজিল পাঁচবার বিশ্বকাপ আর একবার সুপার বিশ্বকাপ জিতেছে। যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎ চারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, চীন, সুইডেন, ফ্রান্সকে টপকে এভারেস্টে উঠে বসে আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৯-য়ে সুইডেনে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপে ভারতীয় দলও অংশগ্রহণ করে। তখন ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলটি এশিয়ার অন্যতম সেরা ছিল। যে সৌভাগ্য ও গরিমা এখনো পুরুষদের কপালে জোটেনি। তবে ১৯৫৪, ১৯৬২ বিশ্বকাপে ভারতীয় পুরুষ দল যেতে পারত এশিয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে। কর্মকর্তাদের অদূরদর্শিতা ও ব্যবসায়ীদের নিস্পৃহ মনোভাবের কারণে শৈলেন মান্না, প্রদীপ ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, জার্নেল সিংহদের বিশ্বকাপ খেলা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ জয় বোধহয় ব্রাজিলিয়ানদের তাতিয়ে দেয়। বাড়তি উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তাই পেরুর বিরুদ্ধে ফাইনালে মাঠে নেমেই আক্রমণের ঝড় বইয়ে দেয় ব্রাজিলিয়ানরা। নিজের দেশে কোপা আমেরিকার আয়োজন করার সুবাদে এমনিতেই ব্রাজিল হট ফেভারিট হিসেবে কাপ অভিযান শুরু করেছিল। সব ম্যাচে সব প্রতিপক্ষকে নিয়ে ছেলে খেলা করে উড়িয়ে দেয়। এই পেরুকেই গ্রুপ লিগের ম্যাচে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ছাড়ে। বস্তুত ফাইনালের আগে পর্যন্ত ব্রাজিল কোনো গোল হজম করেনি। এত ভালো ডিফেন্স সংগঠন ইদানীংকালে ব্রাজিলের কোনো ম্যাচে দেখা যায়নি। গত বিশ্বকাপেও ব্রাজিলের আক্রমণভাগ যতটা ক্ষুরধার ছিল, তার সঙ্গে রক্ষণভাগ যদি যথাযথ সঙ্গত করতে পারত তাহলে হয় ফ্রান্স নয় ব্রাজিলই রাশিয়া থেকে কাপ জিতে ফিরত। বিশ্বকাপে স্বয়ং নেইমার ছিল। কোপায় নেইমারকে ছাড়াই ব্রাজিল হাসতে হাসতে কাপ জিতে নিল।

কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের নবতম আবিষ্কার এভার্ট। অসাধারণ পারফরমেন্স মেলে ধরেছেন তিনি। কখনও উইং দিয়ে সর্পিল গতিতে ভিতরে ঢুকে বডি ফেইন্ট ও ড্রিবলিং সহযোগে বিপক্ষ ডিফেন্স ফালা ফালা করে দিয়ে গোলের পথ খুলে দিয়েছেন। কখনও বা গ্যাব্রিয়েল জেসুস, রবার্তো ফির্মিনদের সঙ্গে ওয়াল খেলে নিজেই ফিনিশ করেছেন। আগামী প্রজন্মের নক্ষত্র ভিনিসিয়াসকে কোচ তিতে সেভাবে ব্যবহার করার সুযোগই পাননি এই ত্রয়ীর অসাধারণ গেম প্ল্যানিংয়ের জন্য। ডিফেন্সে থিয়াগো সিলভা, জানি আলভেস (অধিনায়ক), মাকুইনোস জমাট চক্রব্যূহ রচনা করে দাঁত ফোটাতে দেননি কোনো দলের আক্রমণ ভাগকে। এমনকী সেমিফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা সারাক্ষণ দাপটের সঙ্গে খেলেও ব্রাজিল ডিপ ডিফেন্সে এসে আটকে গেছে। বিশ্বশ্রেষ্ঠ মেসিও উইথ দ্য বল অতিক্রম করতে পারেননি ব্রাজিলের স্টপার জুটিকে। ■

কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি ও তার প্রতিবিধান

সৌমী দাঁ

যৌন হয়রানি একজন মহিলাকে বিভিন্নভাবে, বিশেষ করে তাঁর মানসিক শান্তি ও সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে একজন মহিলা তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে এবং সে নিজের মতো থাকতে আর স্বচ্ছন্দ্য বোধ করে না। ফলে মানসিক ভাবে সে বিপর্যস্ত হয়।

যৌন হয়রানির শিকার হলে কী করবেন

কী কী ভাবে কোনো মহিলা যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে। কীভাবে এই আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারা যায়, কোথায় অভিযোগ করতে হবে, কীভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাবে। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কীভাবে খতিয়ে দেখবে, তদন্ত ও বিচার করবে সে সমস্তই এই আইনে আলোচনা করা আছে।

কে বা কারা এই আইনের আওতায় পড়ে

অভিযোগকারিণী যে কোনো বয়সের বা যে কোনো পদাধিকারের হতে পারে। যে কোনো কর্মস্থলে চাকুরিরতা যখন স্থায়ী, অস্থায়ী, সরকারি বেসরকারি, আধা-সরকারি, হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যে কোনো মহিলাই এমনকী গৃহকর্মী, দিনমজুর বা কারুর কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ করে অথবা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক তারাও এই আইনের আওতায় আসেন এবং অভিযোগ জানাতে পারেন। এমনকী কোনো মহিলা কর্মরত থাকা অবস্থায় যদি কোনো কর্মস্থল পরিদর্শনে যান ও যৌন হয়রানির শিকার হন তারাও অভিযোগ করতে পারেন।

কমপ্লেইন্টস কমিটি ও নিয়োগকর্তার ওপর নির্দেশাবলী

এই আইনে নিয়োগর্তাদের জন্য কিছু নির্দেশ আছে যেমন— মহিলাদের সুস্থ ও সুরক্ষিত কাজের পরিবেশ দিতে হবে। বিভিন্ন সচেতনতা প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদের যৌন





হয়রানির দিকটি সম্বন্ধে অবগত করাতে হবে এবং তার যাতে যৌন হয়রানি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠন করতে হবে। যদি কোনো নিয়োগ কর্তা ওই নির্দেশিকা অমান্য করেন তবে তার জরিমানার ব্যবস্থা আছে। সেই কমিটিতে এই কর্মস্থলে উচ্চপদে কর্মরত কোনো মহিলাকে শীর্ষস্থানে রাখতে হবে। যদি উচ্চপদাধীকারী কোনো মহিলা না থাকেন তবে অন্য কোনো বিভাগ বা কোনো প্রশাসনিক কর্মস্থল থেকে নিয়োগ করতে হবে। এছাড়া এমন একজনকে কমিটি সদস্য করতে হবে যিনি কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া এমন দুজন থাকবেন যাদের যৌন হয়রানির বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আইনের জ্ঞান আছে। যদি কোনো নিয়োগ কর্তার একাধিক স্থানে অফিস থাকে তবে সব বিভাগেই একটি করে কমিটি রাখতে হবে। নিয়োগ কর্তারাই সদস্য মনোনীত করবেন এবং সমস্ত সদস্যদের অর্ধেকের বেশি মহিলা সদস্য রাখতে হবে। সদস্যপদ তিন বছরের অধিক হবে না।

অভিযোগকারিণীকে লিখিতভাবে কমিটির কাছে অভিযোগ জানাতে হবে, অভিযোগ পত্রটিতে যৌন হয়রানি বা হেনস্থার পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে। তারিখ, স্থান, সময়, কাজের জায়গায় দু'পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক এবং অভিযুক্তের নাম ঘটনার বিবরণ সহ জমা করতে হবে।

অভিযোগ দাখিল হবার ৭ দিনের মধ্যে কমিটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাবে ও অভিযুক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে অবগতির ১০ দিনের মধ্যে তার স্বপক্ষে লিখিত উত্তর কমিটিতে জমা করবে।

অভিযোগ পাবার পর কমিটি সেটির অনুসন্ধান, প্রমাণ ও সাক্ষী গ্রহণ করতে পারে। তবে এই অনুসন্ধান, সাক্ষী গ্রহণ ও প্রতিবিধান সমস্ত পদ্ধতিটি ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। এবং একটি প্রতিবেদন জমা করতে হবে।

ঘটনার অনুসন্ধান করার জন্য অভিযোগকারিণী ও অভিযুক্ত দুজকেই হাজির থাকতে হতে পারে। এই অনুসন্ধান ও প্রমাণ সংগ্রহের প্রক্রিয়াটি গোপন রাখতে হবে। কেউ গোপনীয়তা ভঙ্গ করলে ৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। অভিযোগকারিণী যদি শারীরিক বা মানসিক ভাবে অক্ষম হয় তার আত্মীয়, বন্ধু বা তার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই অভিযোগ জমা করতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তির থেকে অভিযোগকারিণী দূরত্ব বজায় রাখার আবেদন করতে পারে। অনুসন্ধান চলাকালীন অভিযোগকারিণী ৩ মাস পর্যন্ত ছুটির আবেদন বা বদলির আবেদন করতে পারে। দোষ প্রমাণ হলে সার্ভিস রুল অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতে পারবে কমিটি। দোষী ব্যক্তির পদোন্নতি আটকানো যাবে। বদলি করে দিতেও পারে। অভিযোগকারিণীকে ক্ষতিপূরণের বিধানও দিতে পারে। তবে এই আইনটি নিয়ে সমাজে আরও সচেতনতা বাড়াতে হবে তবেই এটি সফলভাবে কার্যকরী হবে।

(লেখিকা একজন আইনজীবী)

ইতালিতে সনাতন ধর্মের ব্যাপকতায় হিন্দুদের ভূমিকা

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতালি একটি ক্যাথলিক দেশ, যেখানে অধিকাংশ মানুষই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। সেখানে পৃথিবীর এক অন্যতম আশ্চর্যজনক স্থাপত্য পিসার হেলানো টাওয়ার। বিস্তর জনসমাগম হয় এখানে। পর্যটকরা এখানে এসে টাওয়ারটি দর্শন করেন, ছবি তোলেন। বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। একজন কৃশকায়, ধর্মে হিন্দু, চেন্নাই থেকে আসা সাধারণ চেহারার মানুষ পিসায় ঘরে-তৈরি সিঙ্গারা ও কচুরি বিক্রি করছিলেন। তাঁর সাইকেলের হাতলে ঝোলানো ব্যাগ থেকে তিনি বিক্রির সামগ্রী বের করছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তাঁর আনা খাদ্যসামগ্রী হু হু করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ তাঁর আনা সিঙ্গারা-কচুরির স্বাদ গ্রহণ করে। ভারতীয় খাবার বিদেশে কতখানি জনপ্রিয়, এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটারস্ ব্যাসিলিকাতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় হিন্দু ও শিখ সমাজের লোকজন নানা ধরনের সামগ্রী বিক্রি করছে, পোপের মূর্তি থেকে আরম্ভ করে প্রিন্টেড টি-শার্ট, কী নেই তাদের সম্ভারে। ভেনিসে ভারতীয়দের ইমিটেশন গয়না বিক্রি করতেও দেখা যায়। ভারতীয়দের সারা ইতালিতেই দেখতে পাওয়া যায়। চাষবাসের কাজে, শিক্ষাজগতে, পর্যটনক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং যোগ শিক্ষক হিসাবে ভারতীয়রা কাজ করে চলেছেন। লেবার ব্যুরোর পরিসংখ্যান জানাচ্ছে যে ইতালিতে ১৫০,০০০ জন ভারতীয় বসবাস করছেন।

রোম থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে আনজিও এলাকায় সমুদ্রের ধারে ছোট্ট শহর লাভিনিয়ার একটি নতুন নাম হয়েছে 'লাভ ইন্ডিয়া'। এই নামটি ইতালীয়ানরাও বেসরকারি ভাবে ব্যবহার করে, কারণ এখানে প্রচুর ভারতীয় বসবাস করেন। এখানে প্রচুর ভারতীয় রেস্তোরাঁ ও ভারতীয় দোকানপাট রয়েছে। অনেক মন্দির আছে, গুরুদ্বার আছে যারা প্রসাদ বিতরণ করেন, ভাংড়া নাচও এখানে জনপ্রিয়। আরেকটি জনপ্রিয় বিষয় হলো বলিউড, যে ব্যাপারে ভারতীয়দের আগ্রহ অপরিসীম।

সনাতন ধর্ম সঙ্ঘ নামে একটি জাতীয় ধর্মীয় সংগঠন ইতালিতে আছে যেটি ইতালিতে বসবাসকারী সকল হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করে যারা হিন্দু আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখে। ইতালীয়ান সরকার সরকারিভাবে হিন্দুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে একটি ধর্মবিশ্বাস হিসাবে। আলোর উৎসব হিসেবে দীপাবলী ইতালিতে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইতালির মন্দিরগুলির মধ্যে আছে মাতা গীতানন্দ আশ্রম, অলটারেতে অবস্থিত, পলেসিনে পারমেনসে নামক স্থানে আছে শ্রীনবদুর্গা মন্দির, আরজিগানোতে আছে সনাতন ধর্ম মন্দির, পেগ্‌গনাগাতে আছে বৈষ্ণোমাতা মন্দির, রোমে আছে ওম্ হিন্দু মন্দির, ক্যাটানিয়াতে আছে দুর্গা মা মন্দির ও শিবশক্তি মন্দির।

ইতালির সঙ্গে ভারতের খুবই গভীর বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যেই ভারত এগোচ্ছে। ভারতের লক্ষ্য এদেশে বিনিয়োগ বাড়ানো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি মেলবন্ধন। চর্মশিল্প, বস্ত্র, রত্ন ও গহনার ক্ষেত্রে চিরাচরিত সহযোগিতা তো রয়েইছে।

কেবলমাত্র রোমেই ১৫০০ ভারতীয়ের বাস। এঁদের মধ্যে আছেন শিক্ষক, নৃত্যশিল্পী ও যোগগুরু। সংযুক্তা দাশগুপ্তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, পরে একজন ইতালীয়ান সহকর্মীকে বিয়ে করে ইতালি চলে যান। বর্তমানে রোমের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে Orinental Studies ডিপার্টমেন্টে শিক্ষকতা করছেন। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে, উত্তর ও মধ্য ইতালিতে কর্মরত বহু শ্রমজীবী মানুষ পঞ্জাব থেকে বিভিন্ন সময়ে এসেছিলেন, পঞ্জাব ও কেরালা থেকে আসা রেস্তোরাঁকর্মী, ক্যাথলিক যাজক ও সিস্টার মূলত কেরালা থেকে আসা, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত মানুষজন, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিবাহসূত্রে আসা ভারতীয় মহিলারা, এদের নিয়েই ইতালিতে ভারতীয় জনসমষ্টি।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ইতালীয়ানরা অনেকেই ভারত থেকে দেশে ফেরার সময় ভারতীয় স্ত্রী নিয়ে ফেরেন।

পরিসংখ্যান বলছে, ইতালির অধিকাংশ ভারতীয় পঞ্জাব থেকে আসা কৃষিজীবী। তাঁরা দেশে যা করতেন, বিদেশে এসেও সেই কাজই করছেন। কেউ কেউ চিজ্ তৈরির কাজটাও শিখে নিয়েছেন। রোমের চতুষ্পার্শ্বে লাজিও এলাকায়, দক্ষিণেও নেপল্‌স, বারি ও সিসিলিতে এরা রয়েছেন। ভারতীয়দের ৮০ শতাংশ জনগণকে গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতে দেখা যায়। ইতালির চিজ্‌শিল্পে এদের অবদান অনেক। এইসব জায়গায় প্রতি রবিবার পঞ্জাবি সিনেমা প্রদর্শিত হয়। ইতালিতে শিখদের থেকে হিন্দুদের সংখ্যা কম, তবে তারাও ওই দেশে ভালোই আছেন।

বলিউডের চলচ্চিত্র নির্মাতারা ইতালির সৌন্দর্যমণ্ডিত জায়গাগুলি খুঁজে বের করে সেই সব স্থানে শুটিং করতে যান। মাতেরা নামক স্থানে বহু ভারতীয় কাহিনি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। বেশ কয়েক বছর যাবৎ ভেনিসে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব যার নাম 'River to River' পালিত হয়ে চলেছে। ইতালীয়ানরা ভারতীয় সিনেমা খুবই পছন্দ করেন। যোগাভ্যাস এবং মেডিটেশন ইতালিতে ভারতীয় প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে যখন আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালিত হয়, ইতালিও সোৎসাহে তাতে অংশগ্রহণ করে। ভারতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও ইতালিতে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। মিলানের আয়ুর্বেদ কনফারেন্সে শতাধিক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন। তাঁরা শরীরকে নীরোগ রাখার এই সুপ্রাচীন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন। ইতালিতে বসবাসকারী হিন্দুরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন, পরম্পরাগত অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নিচ্ছেন, পরিশ্রম করছেন, ইতালির সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেও নিজেদের বিশিষ্ট ভারতীয়ত্ব বজায় রেখেছেন এবং তার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে চলেছেন। এখানেই সনাতন ধর্মের জয়। ■

প্রসবের পর মায়ের যত্ন-আত্তি

রিংকী ব্যানার্জি

(ন্যাচারোপ্যাথ)

স্তনের যত্নাদি : শিশুকে দুধ খাওয়ানোর আগে স্তনদ্বয়কে হালকা গরম জলে ধুয়ে, পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে। ঠিক একই প্রক্রিয়া দুধ খাওয়ানোর পরও। তবে সাবান ব্যবহার করা কখনো উচিত নয়, কারণ সাবান স্তন বৃত্তকে শুষ্ক করে এবং দুধ সরবরাহ কমে যায়। কখনো কখনো প্রসবের তিন চারদিন পর স্তনের শিরা রোধ হতে দেখা যায়, স্তনে যখন অতিরিক্ত দুধ জমা হয়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা স্তনের এরিওলার-এর নিকট চেপে দুধ বের করে নেওয়া হয়। তবে কখনো স্তনবৃন্তকে নিংড়ানো উচিত নয়। দেখা যায় যে, গরম জলের সেঁক (পরমেনটেশন) দিলে খুব একটা উপকার হয় না, বরং ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে ব্যথা কিছুটা কমানো যায়। তবে যন্ত্রের সাহায্যে দুধ বের করে নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। এ অবস্থায় ব্রেসিয়ার না ব্যবহার করাও ভালো। যখন স্তনের ব্যথা কমে যায় অতিরিক্ত দুধ বের করে নেওয়ার পর এবং স্তনদ্বয় স্বাভাবিক হয়, তখন পুনরায় শিশু স্তন্য দুগ্ধ পান করতে পারে।



আবার কখন কখন স্তনদান শুরু করলে স্তনবৃন্ত ফেটে যায়। তখন স্তনবৃন্তকে জল দিয়ে পরিষ্কার করে, স্তনবৃন্তে অল্প করে সাদা ভেসলিন বা ক্রিম লাগাতে হবে। আর ওই ক্রিম আবার দুধ খাওয়ানোর পূর্বে ধুয়ে নিতে হবে। তবে দেখা যায় যে, দুই তিন দিন পরে ওই ফাটল শুকিয়ে যায়। স্তনবৃন্তের অবস্থা বুঝে ২৪-৪৮ ঘণ্টার জন্য স্তন্যদান বন্ধ রাখতে হবে। স্তনে যখন দুধ থাকবে না তখন বা বহুক্ষণ ধরে শিশুকে যেন স্তন্যদুগ্ধ না দেওয়া হয়। এবং শিশু যেন ঘুমাতে ঘুমাতে দুগ্ধ পান না করে— এই দুটি উপায়ে স্তনবৃন্তের ফাটল রোধ করা যায়।

পেরিনিয়ামের যত্নাদি : প্রসবের পর স্ত্রী জননাঙ্গে যাতে কোনো রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত না হয়, তার জন্য বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয়। সেই অনুসারে যোনিদ্বার পরিষ্কার রাখা হয়। প্রসবের পর যে লোকিয়া নির্গত হয়, তা যোনিপথে বেরিয়ে আসে। এর জন্য প্রসবের পর প্যাড বা পরিষ্কার কাপড়ের পট্টি যোনিদ্বারে ব্যবহার করা হয়, তা লোকিয়াকে শোষণ করে নেয়। যখন প্যাড নোংরা হয়ে যায় তখন তা পাল্টে নতুন প্যাড ব্যবহার করা হয়, প্রথম ৬-৭ দিন এইভাবে প্যাড ব্যবহার করতে হয়। প্রসবের পর থেকে যোনিদ্বার সাবান বা হালকা গরম জল দিয়ে বা ডেটল হালকা গরম জলে মিশিয়ে, পরিষ্কার করা হয়। এই প্রক্রিয়া সকালে এবং বিকালে ও প্রতি প্রস্রাব বা পায়খানা করার পর করা হয়। তবে প্রসূতিকে খেয়াল রাখতে হবে, প্রথমে যেন সামনের দিকে পরিষ্কার করে ক্রমশ নীচের দিকে অগ্রসর হয়। এতে করে যোনিদ্বার মলদ্বার দ্বারা সংক্রামিত হয় না। এই ভাবে যেমন জননাঙ্গ পরিষ্কার করা হয়, তেমনি প্রতিদিন স্নান করা উচিত, যা দৈহিক পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে এবং আরাম দায়ক বলে অনুভূত হয়।

মূত্রধার ও মলাধারের যত্নাদি : প্রসবের পর প্রসূতি মূত্র ত্যাগ করার সময় যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করে। তবে এটাও ঠিক যে, মূত্রাধারে বেশিক্ষণ মূত্র জমে থাকলে মূত্রনালী জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ কারণে প্রস্রাবের ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রসূতিকে প্রস্রাব করতে বলা হয়। এছাড়া প্রতি ৬-৮ ঘণ্টা অন্তর মূত্র ত্যাগ করতে হবে। যতটা সম্ভব ক্যাথেটার বা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি মূত্রনালী মূত্রাধারে প্রবেশ করানো উচিত নয়। তবে যদি এ রকম হয় যে, প্রসূতি চেষ্টা করেও প্রস্রাব করতে পারছে না এবং ক্রমাগত ব্যথা অনুভব করতে থাকে, তবে ক্যাথেটার প্রবেশ করানো আবশ্যক। তবে ক্যাথেটার প্রবেশের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রসবের পর মলাধারের কার্যক্ষমতা মূলত মন্থর হয়ে যায়। তবে খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি থাকলে এবং জল বেশি পরিমাণে পান করলে পায়খানা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ভাবেই হতে থাকে। তবে যদি প্রসবের তৃতীয় দিনেও পায়খানা না হয়, তবে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে মলাধারের ভিতর তরল ওষুধের প্রয়োগ করিয়ে পায়খানা করানো হয়। তবে আজকাল দেখা যায় যে, প্রসূতি যদি প্রসবের পর সুস্থ ও আরামদায়ক অবস্থায় থাকে, তবে পায়খানা হলো কিনা তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পায়খানা আপনা থেকেই খাওয়া দাওয়া ঠিকমত করলে হয়ে যায়।

অঙ্গ সঞ্চালন ও দৈহিক গতিশীলতা : প্রসবের পর প্রসূতি যত তাড়াতাড়ি পারে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা উচিত। সাধারণত প্রসবের ৬ ঘণ্টা পর প্রসূতিকে সোজা হয়ে বসতে বলা হয় এবং স্তন্যদান করতে দেওয়া হয়। সোজা হয়ে শুয়ে দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে বলা হয় এবং আস্তে আস্তে হাত-পাগুলির নাড়াচাড়া করতে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রসবের পর পেটের পিঠের ও পাছার মাংসপেশীকে শক্তিশালী করার জন্য প্রসূতিকে স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম শিখিয়ে দেয়। প্রসূতিকে আস্তে আস্তে প্রতিদিন কিছু সময় ধরে ব্যায়ামগুলি করতে হবে। প্রসূতিকে প্রসবের দিনই বাথরুমে নিজে হেঁটে যেতে উৎসাহিত করা হয়। তবে হাঁটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সোজা হয়ে হাঁটতে। অনেক সময়ই দেখা যায় প্রসবের পর প্রসূতিকে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটতে। এ সময় ভারী কিছু উত্তোলন করা উচিত নয়। প্রসবের ৬ সপ্তাহ পর প্রসূতির পুনরায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে বা চিকিৎসকের নিকট যাওয়া উচিত।■

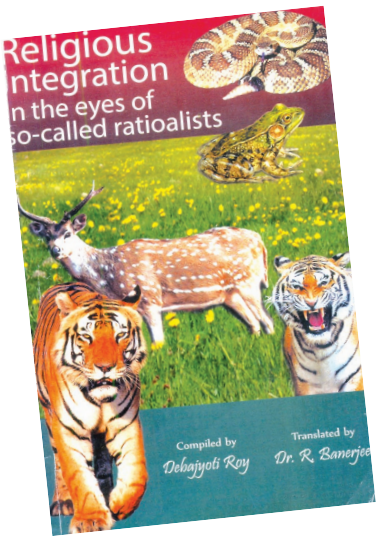
মাটির নীচে কাফেরের হাড়গোড়, ওপরে ইসলামের জয়স্তম্ভ

সন্দীপ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম আর ধর্মতন্ত্রকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন, ধর্ম ভালো কিন্তু ধর্মতন্ত্র ভয়াবহ। এ কথার গভীরতা বুঝতে হলে আগে বুঝতে হবে ধর্মতন্ত্র কী? ধর্মতন্ত্র হলো কোনও একটি ধর্মকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ব্যবস্থা। কিন্তু ব্যবস্থাটি গোড়ায় ধর্মপ্রচারকদের মুখের মিষ্টি কথা এবং উদার-সহিষ্ণু আবহে বাঁধা থাকলেও কালক্রমে অন্যরূপ ধারণ করে। এই ব্যাখ্যা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মের ক্ষেত্রে। ধর্মতন্ত্রকে ব্যবহার করে কীভাবে অন্য ধর্মের মানুষের মনে সীমাহীন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে হয় এবং পর্যায়ক্রমিক হামলা, খুনখারাবি, লুঠতরাজ, নারীধর্ষণ এবং ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে কীভাবে অসহায় ভিন্নধর্মীদের স্বধর্মত্যাগে বাধ্য করতে হয়, এই দুটি ধর্ম তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ভারতবর্ষ প্রায় আটশো বছর ইসলামি শাসনব্যবস্থায় ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে এদেশে ইসলামি ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা কিছু কম হয়নি। বস্তুত সে চেষ্টা এখনও চলছে। ইসলামের নখরাঘাত থেকে না বাঁচলেও ভারতবর্ষের অস্তিত্ব এবং অস্মিতা যে মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, ইজিপ্টের মতো ভেঙে পড়েনি তার কারণ এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থা। ভারতে রাজশক্তি চিরকালই মাথার মুকুটের মতো। বারে বারে তার রং বদলায়, ঢং বদলায় কিন্তু এই পরিবর্তনের কোনও প্রভাব সমাজ শরীরে পড়ে না। এই সমাজ অধ্যাত্মবাদী। রাজা তার কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মাত্র। যেখানে স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজমান সেখানে তার প্রতিনিধিদের মধ্যে কে থাকলেন আর কে গেলেন তাতে বিশেষ কিছু হেরফের হয় না।

কিন্তু ভারতবর্ষের রক্ষা পাওয়ার অর্থ নিশ্চয়ই তাকে ধ্বংস করার সংকল্প এবং প্রয়াসগুলি মিথ্যে হয়ে যাওয়া নয়। অথচ ভারতের বুকে ইসলামি সন্ত্রাসের সঙ্গে ইসলামি ধর্মতন্ত্রের যোগসূত্রটিকে বারংবার মিথ্যে এবং অনৈতিহাসিক প্রমাণের চেষ্টা করে চলেছে এদেশের একাধিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও অনস্বীকার্য, এদের মধ্যে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনও।



উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে' শীর্ষক একটি নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে ইসলাম আদতে শান্তির ধর্ম। শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্মের বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্যগুলি ভাষার মারপ্যাঁচে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন নিবন্ধকার। এসবেরই প্রতিবাদে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন দেবজ্যোতি রায়। পুস্তিকাটি প্রথমে বাঙ্গলায় প্রকাশিত হয়। তারপর বেরোয় এর ইংরেজি অনুবাদ। নাম, Religious Integration in the eyes of So-Called rationalist। অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বইটির পাতায় পাতায় প্রথমেই যেটি চোখে পড়ে তা হলো লেখকের পরিশ্রম। লেখক যে কোরান এবং হাদিশ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল তার প্রমাণ মেলে বইটির ছত্রে ছত্রে। কোরানের অজস্র আয়াত উল্লেখ করে লেখক দেখিয়েছেন, ইসলামের



পুস্তক প্রসঙ্গ

এই তথাকথিত মহাগ্রন্থ কীভাবে মহম্মদ বিন কাশেম থেকে শুরু করে আজকের মাসুদ আজাহার পর্যন্ত --- অগণন মুসলমান জনতাকে অ-মুসলমান মানুষ এবং অ-মুসলমানরা সভ্যতা ধ্বংস করার প্রেরণা জুনিয়েছে। মানবসমাজকে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী এই দুই ভাগে ভাগ করেছে কোরান। স্পষ্ট বলেছে, অ-মুসলমান কাফেরকে হত্যা করা পাপ নয়। বরং তা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। যে মুসলমান এই কর্তব্য পালন করবে তার ঠাঁই মিলবে বেহেস্তে। এই কথাগুলোই কি মাসুদ আজাহাররা সাধারণ মুসলমান যুবকদের জঙ্গিবাদে দীক্ষা দেবার সময় বলেন না? এরপরও কি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা বলবেন ইসলাম শান্তির ধর্ম?

স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুত্বকে রক্ষা করাই ছিল মিশনের উদ্দেশ্য। এহেন রামকৃষ্ণ মিশন এখন ইসলামের যাবতীয় কলঙ্ক চাপা দিয়ে তাকে মহান বানাবার সাধনায় ব্রতী। এসব দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, রামকৃষ্ণ মিশনও কি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গেল? নাকি প্যান-ইসলামিক অ্যাজেন্ডার অংশীদার হবার আহ্বান এড়াতে পারল না।

দেবজ্যোতি রায়ের প্রয়াস সাধুবাদ যোগ্য। রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদও চমৎকার। কিন্তু বইয়ের প্রচ্ছদটি আরও ভালো হতে পারত। বিশেষ করে প্রচ্ছদে বইয়ের নামের বানানে মারাত্মক ত্রুটি চোখকে পীড়া দেয়। প্রচ্ছদের ছবিটিও আশানুরূপ নয়।

রিলিজিয়াস ইনটিগ্রেশন ইন দি আইজ অব শো-কলড্ ন্যাশনালিস্ট।
লেখক : দেবজ্যোতি রায়। বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩। মূল্য : ত্রিশ টাকা।

মালদা সীমান্তে গোরুপাচারের আড়ালে চলছে জঙ্গি তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মালদা জেলার সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে গোরুপাচারের আড়লে জঙ্গি অনুপ্রবেশ। মালদার কালিয়াচকের নাম আন্তর্জাতিক মানচিত্রে জালনোট ও অন্যান্য অপরাধ জগতের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বার বার উঠে



এসেছে। বিএসএফ সূত্রে খবর, গত ১১ জুলাই কালিয়াচকের বৈষ্ণবনগর এলাকার শিবপুর ঘাটে বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশে প্রচুর সংখ্যক গোরু আটক করার পর জঙ্গি অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় বিএসএফকে সতর্ক করে তাদের নিজস্ব গোয়েন্দ বিভাগ।

সূত্রে প্রকাশ, কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ এই মর্মে বিএসএফকে সতর্ক করেছিল। এদিন গোরুপাচার রুখতে বিএসএফ রাতভর তল্লাশী চালানোর পাশাপাশি এলাকার কুখ্যাত গোরু পাচারকারী জামাল শেখ, আব্দুল কাদের, রফিক শেখ ও সীমান্তবর্তী দৌলতপুর এলাকার জয়নাল শেখের খোঁজে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালায়। বিএসএফ তাদের প্রহরা দ্বিগুণ বাড়িয়েছে। গত কয়েকদিনে জেএমবি জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলের উদ্বেগ বেড়েছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মালদা জেলার ৬৫ কিলোমিটারের বেশি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা নদীপথ। বর্ষাকালে নদীগুলিতে জল বাড়ায় নদী দিয়ে গোরু পাচারের আড়ালে জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারেনি কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। তাই সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো, অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন করা ও রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল। এর আগেও বিএসএফের পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদ, মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাজুড়ে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওনাপুর- শোভাপুর সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্র-সহ অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে জঙ্গিরা। বিডিআর এবং বিএসএফ-এর যৌথ উদ্যোগে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হলেও রাতভর গুলির লড়াই চলে। বিএসএফের দাবি, তাতে এক জঙ্গি মারা পড়ে। শোভাপুর গ্রামের নদীর ওপারে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কয়েক মিটার দূরে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বখেরআলি এলাকা থেকে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করে। তার আগে নদীপথে এই অস্ত্র ভারতে পাচারের সময় বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষীর গুলিতে এক জঙ্গি নিহত ও এক জঙ্গি আহত হয়।

সব মিলিয়ে মালদা জেলার সীমান্ত এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে এবং বিএসএফ-ও সদা তৎপর রয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনীর যৌথ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহ মহম্মদ মৈইনুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় সদর কার্যালয়ে ১৫ থেকে গত ১৮ জুলাই পর্যন্ত আঞ্চলিক স্তরে কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং সেদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন। এই সফরে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডার, ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার, ইন্সপেক্টর জেনারেল রাজন বারগোত্র এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দুই দেশের মৎস্যজীবীদের জলসীমা পেরিয়ে মাছ ধরার মতো স্পর্শকাতর বিষয়, তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান সামুদ্রিক নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দু-দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের আলোচনা হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা বিনিময় নিয়েও আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশায় সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলিও বৈঠকে পর্যালোচনা হয়েছে।

এই প্রতিনিধি দলটি ১৭ তারিখ হলদিয়া সফর করে। সফরকালে তারা হোভারক্রাফ্ট পরিচালনার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর হোভারক্রাফ্টে প্রশিক্ষণ নেবেন। উদ্ধারকাজ ও তল্লাশির সময় পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দূষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় দু-দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বিগত ২০১৫ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তার বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। এই সমঝোতাপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উভয় দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ২০১৭ সালের এপ্রিলে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কম পুঁজির অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থানের বেশি সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিসংখ্যান এবং কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তর (এনএসএসও)-এর ৭৩তম সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ সালে অসংগঠিত, কৃষিভিত্তিক নয় এরকম অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের সংস্থাগুলিতে ১২ কোটি ১০



লক্ষ লোক কর্মরত। এইসব সংস্থাগুলি, ১৮৪৮ সালের কারখানা আইনের ২এম (১) এবং (২), ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন এবং ২০০৮-এর ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাসিফিকেশন-এর এফ শাখায় নথিভুক্ত।

প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (পিএমইজিপি) অনুযায়ী ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার, ৩ লক্ষ ২৩ হাজার, ৪ লক্ষ ৮ হাজার, ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার এবং ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

কম পুঁজির অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সংস্থায় বেশি সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পিএমইজিপি-র রূপায়ণে পরিসংখ্যান এবং কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক কাজ করছে। ঋণে ভরতুকি দেওয়ার ফলে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ২২৭২০, ত্রিপুরায় ৯০৭২, অসমে ২০০১৬, আন্দামান-নিকোবরে ৮০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯,৩০৪, ত্রিপুরায় ৯৪৩২, অসমে ২৯,৮৯৬ এবং আন্দামান-নিকোবরে ১৮৩২টি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক এই ক্ষেত্রে কর্মসৃষ্টির লক্ষ্যে পিএমইজিপি, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ ক্লাস্টার উন্নয়ন কর্মসূচি (এমএসইসিডিপি), উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং সিকিমে এই ধরণের শিল্পে উৎসাহদান কর্মসূচি, টুল রুম ও প্রযুক্তিকেন্দ্র, মিশন সৌর চরখা, এসএফইউআরটিআই, অতিক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ঋণদান কর্মসূচি, ভরতুকিযুক্ত ঋণদান এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণদান ছাড়াও কেন্দ্র অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগের জন্য ঋণদানের লক্ষ্যে সিজিটিএসএসই তহবিল গঠন করেছে।

উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতিতে নিয়ম-কানুন আগের থেকে সহজ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির থেকে নিয়মিতভাবে উন্নয়নমূলক কাজের বিভিন্ন প্রস্তাব পেয়ে থাকে। গত তিন বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়েছে। মন্ত্রকের নন-ল্যাপসেবল সেন্ট্রাল পুল অব রিসোর্সেস (এনএলসিপিআর), উত্তরপূর্বাঞ্চল পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি (এনইএসআইডিএস), কার্বি অংলং স্বায়ত্বশাসিত আঞ্চলিক পর্ষদ (কেএইচটিসি), বোড়োল্যান্ড আঞ্চলিক পর্ষদ (বিটিসি), ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক পর্ষদ (ডিএইচএটিসি) এবং সামাজিক ও পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (এলআইডিএফ) থেকে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

এই প্রকল্পগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়া রাজ্য সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। মিজোরাম সরকার জানিয়েছে, পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র না মেলায় এই মন্ত্রকের অনুমোদিত লুংগলেই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটির কাজ শুরু করা যায়নি। উত্তরপূর্বাঞ্চলের বাকি রাজ্যগুলি থেকে অন্য কোনও প্রকল্প অবশ্য ছাড়পত্রের জন্য আটকে নেই।

রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ড. জীতেন্দ্র সিংহ এই তথ্য জানিয়েছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

পশ্চিমবঙ্গে পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র এবং পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে পাসপোর্ট মেলার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগামী ২৭ জুলাই কলকাতা, শিলিগুড়ি এবং আগরতলা পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্র ও বনগাঁ, রানাঘাট, বিডন স্ট্রিট এবং কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রে পাসপোর্ট মেলার আয়োজন করা হবে। এই মেলায় পাসপোর্ট আবেদনকারীদের তালিকা



বুধবার ১৭ তারিখ বিকাল ৩-৩০ মিনিট থেকে www.passportindia.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। কলকাতা কেন্দ্রে ১৪০০টি সাধারণ শ্রেণী, শিলিগুলি কেন্দ্রের ১৫০টি সাধারণ শ্রেণী, আগরতলা কেন্দ্রের ১১০টি তৎকাল শ্রেণীর ও বনগাঁ, রানাঘাট, বিডন স্ট্রিট এবং কৃষ্ণনগর ডাকঘরের প্রত্যেকটিতে ৫০টি সাধারণ শ্রেণী পাসপোর্টের জন্য আবেদনকারীরা সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য পাসপোর্টের দরখাস্ত বিবেচনা করা হবে। আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারের সময় তাদের অ্যাপ্লিকেশন রেফারেন্স নাম্বার (এআরএন) এবং ঠিকানা, জন্মতারিখ-সহ পরিচয়ের নথিপত্র আসল ও প্রত্যায়িত কপি নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনীয় নথির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকেও পাওয়া যাবে। আবেদনকারীরা অনলাইনের মাধ্যমে পাসপোর্টের ফিজ জমা দিতে পারেন। www.passportindia.gov.in-এর মাধ্যমে যে সমস্ত আবেদনকারীরা ২৭ তারিখ সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাবেন, তাঁদের আবেদনগুলিই সেদিন গ্রাহ্য করা হবে। যাঁরা ইতিমধ্যেই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছেন এবং ওয়াক-ইন ও পিসিসি-র আবেদনকারীরা এই মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন না।

চীন সীমান্ত বরাবর পরিবহণ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সীমান্ত বরাবর কৌশলগত পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজকর্ম সুসংহতভাবে চালানো হচ্ছে। এর আওতায় রয়েছে— সড়ক নির্মাণ, রেল লাইন নির্মাণ, সুড়ঙ্গ নির্মাণ ইত্যাদি। সীমান্তবর্তী এলাকায় যে কোনও আবহাওয়ায় যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি রাখতেই সার্বিক এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এজন্য ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত সীমা সড়ক সংস্থার কর্মপরিকল্পনায় সংশোধন এনে ২৭২টি সড়ক নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য ১৪ হাজার ৫৪৫ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এই ২৭২টি সড়কের মধ্যে ৩৩২৩.৫৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৬১টি সড়ককে কৌশলগত সড়ক চিহ্নিত করা হয়েছে। ২৩০৪.৬৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি রাস্তা নির্মাণের কাজেও প্রগতি এসেছে। উল্লিখিত সড়কগুলির নির্মাণ সম্পন্ন হলে সীমান্ত এলাকায় যাতায়াত সহজ হবে। রাজ্যসভায় সম্প্রতি এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রীপাদ নায়েক।

খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৭-১৮ থেকে 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পটি সারা দেশে রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় মেধা অন্বেষণ ও বিকাশ কর্মসূচিতে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের ৮ বছর ধরে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। এই কর্মসূচির আওতায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ হয় না। স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া কেন্দ্রীয়ভাবে এই কাজটি করে থাকে।

মেধা অন্বেষণ এবং বিকাশ কর্মসূচির আওতায় ২০টি ক্রীড়া শাখার ২ হাজার ৪৩৭ জন ক্রীড়াবিদকে নির্বাচিত করা হয়েছে এই বৃত্তি প্রদানের জন্য। এর মধ্যে ২ হাজার ৪৩৩ জন ক্রীড়াবিদকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯-এ পশ্চিমবঙ্গের ৮২ জন বৃত্তি-প্রাপক এই কর্মসূচি দ্বারা উপকৃত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের ৯৩ জন ক্রীড়াবিদকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এই তথ্য জানান।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার মশাট খণ্ডের রাধাবল্লভপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা খণ্ড সেবা প্রমুখ ডাঃ ভাস্কর হাজরার পিতৃদেব মদনমোহন হাজরা গত ১৫ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও ২ পুত্রবধূ রেখে গেছেন।

* * *

গত ১ জুলাই হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ডাঃ সুনীল কুমার সেন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি সমাজ সেবা ভারতীর সহ সম্পাদক এবং ভারতীয় হোমিওপ্যাথি সমাজের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর দুই পুত্রই স্বয়ংসেবক।

* * *

কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক নীরেশ চন্দ্র দাসের সহধর্মিণী প্রতিমা দাস গত ২৪ জুন বারুইপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের স্বয়ংসেবক তথা জেলা সেবা প্রমুখ বিমান ঝা গত ৩ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তার আগে বেলাকোবায় সারদা শিশু তীর্থের প্রধানাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিজের বাড়িতেও তাঁর দাদা বিনয়ভূষণ ঝা'র প্রেরণায় শিশু তীর্থ শুরু করেন। একল বিদ্যালয়েরও দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী খণ্ডকার্যবাহ কৃষ্ণেন্দু সরকারের পিতৃদেব কিরণ চন্দ্র সরকার গত ১২ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধে তাঁর বড়ো পুত্র কিশোর সরকার শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন জেলা সেবা প্রমুখ শিশির গাঙ্গুলির হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রবীর ব্যানার্জি গত ১জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি মা, ৩ ভাই, ১ বোন ও ভাইপো-ভাইঝিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি অকৃতদার ছিলেন। পানিহাটি পৌরসভায় দুই বারের পৌরপিতা ছিলেন।

* * *

কলকাতা মধ্যভাগের বিবেকানন্দ নগরের বীরেশ্বর প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক শুভম ঘোষের মাতৃদেবী তপতী ঘোষ গত ১৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি তাঁর স্বামী ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

বাঁকুড়া নগরের বাঁকুড়া প্রভাত শাখার মুখ্যশিক্ষক সুব্রত দাসের পুত্র সামর্থ্যর মুখেভাত অনুষ্ঠানে পরিবারের সবাই সম্মিলিত ভাবে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলার সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ সৌমিত্র মণ্ডলের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর বাবা নিবাস মণ্ডল ও মা শেফালী মণ্ডল সমাজ সেবা ভারতীর কার্যকর্তা শিবদাস বিশ্বাসের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী, নগর সঙ্ঘচালক সমীর সাহা সহ বহু স্বয়ংসেবক কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

* * *

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী খণ্ডের বদলপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা খণ্ড ব্যবস্থা প্রমুখ রমেণ রায়ের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর দাদা ভটারু রায়। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আসানসোল জেলার চিত্তরঞ্জন নগরের স্বয়ংসেবক তথা জেলা প্রচার প্রমুখ প্রদীপ কুমার সিংহ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাকেশ কুমার সিংহের শুভবিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

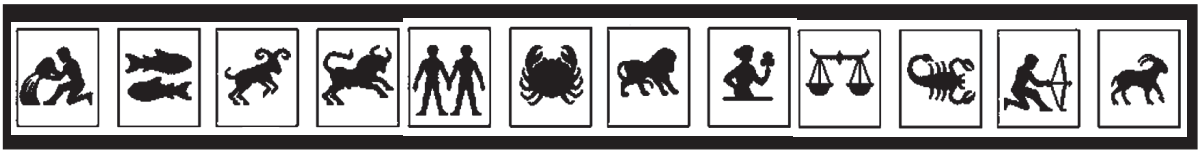
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



২২ জুলাই (সোমবার) থেকে ২৮ জুলাই (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে শুক্র-রাহু, কর্কটে রবি-মঙ্গল-বক্রী বুধ, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি। ধনুতে বক্রী শনি-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মীনে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র থেকে বৃষে রোহিণী নক্ষত্রে।

মেষ : জ্ঞানে, বিদ্যায়, প্রেমে, সৃষ্টিশীলতায় আত্মমগ্ন, বিভোর ও অপরিমেয় শক্তির প্রকাশ। আত্মীয় বৎসলতার জন্য অর্থব্যয় ঘটলেও হঠাৎ প্রাপ্তিতে হতাশার অভিব্যক্তি ম্লান হয়ে যাবে। সন্তানসন্ততির উচ্চশিক্ষা, ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতিষ্ঠার শুভ খবর আনন্দ দেবে। কর্মসূত্রে ভ্রমণ ও পিতার শারীরিক চিকিৎসায় উদ্বেগ। পূর্ব প্রেমের কারণে পরিণয়ে বিঘ্ন।

বৃষ : বেহিসেবি চাল-চলনে শারীরিক অসুস্থতা, ভালো সুযোগের সদ্ব্যবহারে অপারগ ও ব্যবসায় বিশ্বস্ত লোকদ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। নানারকম জ্ঞান আহরণে বিদ্যার্থীদের মন ব্যাপৃত থাকবে। কর্মক্ষেত্রে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। গৃহ ও বাহন যোগ। গৃহে শুভ অনুষ্ঠানে অতিথি সমাগম। নতুন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন। স্ত্রীর বাচালতা ও উগ্রতায় পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি।

মিথুন : চলতি সপ্তাহে দুঃসাধ্য সাধনায় দৃঢ় প্রত্যয়ে অনলস কর্মে ব্রতী থাকবেন। জ্ঞানের দুর্লক্ষ্য, দুর্গমতায় বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতি ও পাণ্ডিত্য প্রভাবে খ্যাতিলাভ করবেন। শ্রমিক-কৃষক অনুকূল পরিবেশে দুর্দমনীয় মানসিকতায় পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবেন। সুন্দরের পূজায় মিষ্ট স্বভাবে প্রেমিক পরিপূর্ণ আত্মমগ্নতায় তৃপ্তি ও আনন্দ পাবে। কর্মপ্রার্থী বিষণ্ণতার অবসানে প্রফুল্লমনে বিরাজ করবে।

কর্কট : স্বীয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় বিদ্যা-বিত্ত-বৈভব-দাতা-সুবেশী লোকরঞ্জনাদি গুণে সম্মান এবং আদর্শ গৃহী, প্রিয় স্বামী অথবা দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক। বিভাগীয় প্রধান বিচারক, বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, তথ্যপ্রযুক্তিবিদের উদ্ভাবনী শক্তি-প্রতিভাত প্রান্তভাগে রহস্যজনক কাজে প্রবণতা বৃদ্ধি।

সিংহ : জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতায় দৃঢ়তা ও নিষ্ঠায়, কর্ম, ব্যবসা, বিদ্যার্জন, যশ, সৌভাগ্যের বাতাবরণ ও উদার মনোভাবে আগামী মনোবাঞ্ছা পূরণ। বিশেষত ভ্রাতা-ভগ্নীর সাহিত্যিক, কবি, নাট্যব্যক্তিত্ব কলাকুশলীদের প্রতি স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ ও প্রাপ্তির ভাণ্ডার অপ্রত্যাশিত। ব্রণ, রক্তচাপ ও বায়ুজনিত রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন।

কন্যা : আর্থিক অপ্রতুলতা, গুরুজনের অসুস্থতা, পুত্র-কন্যার জন্য দুশ্চিন্তা, পুরানো সমস্যার পুনরুত্থান, কর্মস্থানে অস্বস্তিকর পরিবেশ মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধির কারণ। ক্রয়-বিক্রয় ও ভ্রমণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। সপ্তাহের শেষভাগে ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় জগতের আনন্দ যজ্ঞে নব উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত জীবন।

তুলা : ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং, অনুবাদক, চিত্রকর, সাংবাদিক, শাস্ত্রজ্ঞের গৌরব। কর্মের যোগসূত্রে বিবাহ বন্ধনের যোগ। গৃহস্থালীর সংস্কার অথবা নব-নির্মাণ। স্ত্রীর কর্মসংক্রান্ত শুভ সংবাদ ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। চলাফেরায় সাবধানতা ও উত্তেজনাকর পরিবেশ এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক : গোপনীয়তা, রহস্যজনক কাজ, অসৎসঙ্গ, কর্মপরিবর্তনে আত্মজনের প্রতি দ্রোহ আচরণ ও লোভে চিত্তবৃত্তি নষ্ট। সন্তানের মেধা ও দক্ষতায় সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা। মধুর সুললিত বাকচাতুর্যে জনতা জনার্দনের মন জয় ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। প্রেমিক থেকে পরিণয়ের সার্থক প্রয়াস। কনিষ্ঠের দুরূহ কাজে সফলতা, পরিবারে নবাগতের আগমনের সম্ভাবনা।

ধনু : বিবাদ, ব্যয়াধিক্য, অসুস্থতা, বিসদৃশ আচরণ, মিত্র আত্মীয়স্বজন হানি, স্থানান্তর কর্মে অনীহা, মানসিক অবসাদ। সপ্তাহের শেষাংশে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাবল্যে জীবনের ঝরাপাতায় সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের সূচনা। আত্মবিশ্বাসে উত্তরাধিকার ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ। সুহৃদ সম্পর্কে বিশেষ কোনো সুযোগ ও পারিবারিক মেলবন্ধনে আনন্দঘন পরিবেশ।

মকর : গুরুজন দেবদ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধা, গৃহে শুভ অনুষ্ঠান, দয়ার্দ্র হৃদয় ও উদারতায় সমাজসেবামূলক কর্ম ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জনে সফল মনস্কাম। বিদ্যার্থী, শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের জ্ঞানের বহ্নিশিখায় প্রতিভার বিচ্ছুরণ। সন্তানের দিশাহীন আচরণ। আর্থিক শ্লথগতি উদ্বেগের কারণ।

কুম্ভ : চলমান সপ্তাহে চঞ্চল মানসিকতায় কর্মক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সপরিবার দূর ভ্রমণ। স্ত্রীর বৈষয়িক উন্নতি পারিবারিক সমৃদ্ধির সহায়ক। রমণীর সুধাময় দৃষ্টিতে দগ্ধ হৃদয়ে শীতল বারিধারার প্রলেপ। মাতার স্বাস্থ্যহানি, পাওনা আদায়ে বিলম্ব, বেকারদের আসন্ন সিদ্ধি করায়ত্ত হয়েও হবে না।

মীন : ভ্রাতা-ভগ্নী ও প্রতিবেশীর অনভিপ্রেত ব্যবহারে সম্পত্তি বিষয়ক আইনি জটিলতায় ভারাক্রান্ত মন। বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যানুরাগীদের সামাজিক অনুষ্ঠানে সমাদর ও সম্ভ্রম প্রাপ্তি। পেশাগত উন্নতি, কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। এ সপ্তাহে বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর ন্যায় ব্যবসার প্রসার ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য